

থর মরুভূমিতে বন্য উটের দল - আলোকচিত্রী- শ্রী সুদীপ্ত দত্ত

আমাদের ছুটি - ১৭শ সংখ্যা



~ ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা - অগ্রহায়ণ ১৪২২ ~

বড়ে অচ্ছে লাগতে হ্যায় ইয়ে ধরতি ইয়ে নদিয়া ইয়ে রয়না...

গত ক'বছর ধরেই লাদাখ যাওয়ার ইচ্ছে, কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠছিল না কিছুতেই নানান বাধায়। তাই এবারের পুজোতে আর সুযোগ হাতছাড়া করলাম না যতই শরীর বিক্ষোভ দেখাক আর লাদাখে বেড়ানোর 'সিজন' শেষ হয়ে আসুক না কেন।

মধ্য অক্টোবরের লাদাখের প্রকৃতিতে যেমন নিষ্ঠুরতা আছে আবার সৌন্দর্যও। রুক্ষ্ম অথচ রঙিন পাহাড়, হেমন্তের শেষবেলায় পাতা ঝরানোর আগে লাল-হ্লুদ-সবুজ গাছ, ইতিহাসে পড়া সিন্ধু নদের উচ্ছুলতা, শীতল মরুভূমির উদাসীনতা, আবার ঘন নীল জলের পাহাড়ি লেক আর পাহাড়ি মানুষের নির্মলতা। দেখা হলেই হাসিমুখে চেনা-অচেনা মানুষ পরস্পারকে বলেন – জুল্লে। এর অর্থ নমস্কার। স্বাগত বা বিদায় সব ক্ষেত্রেই এটা চলে।

ভ্রমণ মানে দেখা, আর এবারে আরও মনে হচ্ছে কী উপলব্ধি করলাম সেটাও।

নির্জনতা, বিশালতু, রুক্ষা সৌন্দর্য, শান্তি... কে জানে আরো কত কী...

বড়ে অচ্ছে লাগতে হ্যায়...

লেহ্ তে আমাদের হোটেলের কেয়ারটেকার-ম্যানেজার-রূম সার্ভিস বয় একাধারে সবকিছুই ছিল একমাত্র কর্মচারী ধনগিরি বোম্ ঠোকরি। নাম শুনে আঁতকে উঠলেও, মিশতে গিয়ে মনে হচ্ছিল যেন বিভূতিভূষণের ডায়েরি থেকে উঠে আসা কোনও চরিত্র। নেপালের ছেলে - তিরিশের গোড়ায় বয়স, প্রভু যীশুর অসম্ভব ভক্ত, যীশুর বাণী প্রচার করতে গিয়ে অনেক বিপদেও পড়েছে বিভিন্ন সময়ে। বড়সড় একটা বাঁধানো খাতায় নিজের কথা, যীশুর সম্বন্ধে নিজের ধারণা, স্বরচিত ঈশ্বরগীতি এসব লিখে রাখে। ভারী হাসিখুশি মিশুকে, হাসতে হাসতে বলে অনেকে তো আমাকে পাগল বলে সবসময় যীশুর কথা বলি বলে। আমরা ফিরে আসার আগের রাতে দীর্ঘ প্রার্থনা করল আমাদের জন্য।

জীবনে চলতে চলতে কিছু কিছু চরিত্র মনে আঁকা হয়ে যায়, ধনগিরি তেমনই এক মানুষ।

একদিকে বন্ধ আর অন্যদিকে ডাল লেকের ধারে ট্যুরিস্টদের হইচই, কী আশ্চর্য জীবন এই কাশ্মীরে। যাঁরা আজ দোকান খুলেছেন তাঁরা জানেন না কাল খুলতে পারবেন কিনা। রাস্তায় যেতে যেতে ড্রাইভার ফোনে অন্যদের কাছ থেকে জানতে জানতে এগোন পথ নিরাপদ আছে নাকি অন্যপথে এগোতে হবে। রাস্তার তুপাশে সারি সারি বন্ধ দোকান, সদা সতর্ক সি.আর.পি.এফ. জওয়ান, নাকে আসছে টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝ, চোখ পড়ছে পথে ছড়িয়ে থাকা পাথরের টুকরোর দিকে। একটু আগেই বিক্ষোভ হয়ে গেছে। এই কাশ্মীর, এই শ্রীনগর।

এরপরেও পথেই আলাপ ড্রাইভার হাসিমুখে আমাদের সাহায্য করেন অযাচিতভাবে, পথচলতি মানুষ রাস্তার হদিস বাতলে দেন সুন্দরভাবে, জানতে চান বুঝতে পারছি কিনা, কাশ্মীরি দোকানীর সুভদ্র ব্যবহার মন ছুঁয়ে যায়।

দিল্লির রাস্তায় যত ভিখিরি চোখে পড়ল তার বড় অংশই শিশু। আসার সময় একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখছিলাম শারীরিক কসরতের খেলা দেখাছে রাস্তার ট্রাফিক সিগনালে, ফেরার সময়ও চোখে পড়ল তাকে আরও তুই সঙ্গী সমেত। একটি মেয়ে ছোট ঢোল বাজাছে।এমনকী যে কচি বাচ্চাটাকে নিয়ে মা ভিক্ষা করছিল সেও মায়ের কোল থেকে হাত বাড়িয়ে ধাক্কা মারছিল গাড়ির জানলার কাচে হাসিমুখে, একবার হাত পাতছিল আর আরেকবার মায়ের দিকে তাকাছিল। কলকাতার ফুটপাথে ঝুপড়িবাসী ভিখারি শিশু দেখার অভ্যস্ত চোখেও রাজধানীর ঝকঝকে রাস্তায় দামী গাড়ির ভিড়ে এই বালকবালিকাদের কেমন যেন অদ্ভত ঠেকল। এও ভারতবর্ষ।

এই সংখ্যায় -



জীবনে প্রথমবার ট্রেকিং করতে গিয়ে ঘুরেছিলেন হেমকুণ্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিয়ুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুণোত্রী। ফিরে এসে ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছিলেন ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা।

- সুবীর কুমার রায়ের ভ্রমণ ধারাবাহিক হিমালয়ের ডায়েরি'-র ষষ্ঠ পর্ব - "অতিকষ্টে লঙ্কা ও গঙ্গোত্তী"

~ আরশিনগর ~

অন্যস্বাদের উত্তরবাংলা – সৈকত গুপ্ত





<u>সান্দাকফুর পথে চলে যেতে যেতে</u> – পল্লব চক্রবর্তী

~ <u>সব পেয়েছির দেশ</u> ~

পায়ে পায়ে মরুর দেশে - সুদীপ্ত দত্ত





মদমহেশ্বরের মায়ায় - সুমন্ত মিশ্র

ভারতের উত্তরতম প্রান্তভূমিতে – জামাল ভড়





অমরনাথ দর্শন – গুল্রনীল দে

~ ভুবনডাঙা ~

श्रक्र-এর দিনগুলি রাতগুলি – শ্রাবণী ব্যানার্জি





ভেনিসে একটা দিন – অর্পিতা কুন্ডু চ্যাটার্জী

~ শেষ পাতা ~

লেপচাজগতে – উদয়ন লাহিড়ি

প্রকৃতির রঙ-তুলিতে আউলি – আশীষ গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের মূল ভূখণ্ডের শেষবিন্দু – সোমদত্তা চক্রবর্তী



To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.



নাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - হিমালয়ের ডায়েরি (ষষ্ঠ পর্ব)

আগের পর্ব - গঙ্গোত্রীর পথে

অতিকষ্টে লঙ্কা ও গঙ্গোত্রী সুবীর কুমার রায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

ব্রিজটার কাছে একটা গাছের তলায় চায়ের দোকান। দোকানে একজন সাধু গোছের লোককে দেখলাম। একে গতকাল গাংগানীতে দেখেছিলাম। গরমকুণ্ডে রান্নাবান্না করতেও দেখেছিলাম। আরেকটু এগিয়ে একটা আধা শহর। গোটা তিনেক বাস দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়িতে সোয়া দশটা বাজে। কোনটা যাবে জিজ্ঞাসা করে, নাম্বার জেনে নিয়ে, বাসে উঠে জায়গা দখল করলাম। এই প্রথম দেখলাম ড্রাইভারের একটু পিছনে, গ্রিলের পার্টিশন দিয়ে প্রথম শ্রেণী। পিছনে চারটে লম্বা রো। এগুলো দ্বিতীয় শ্রেণী। ভাড়া হয়তো কিছু কম। প্রথম শ্রেণীতে একটা লম্বা বড় সিট, ড্রাইভারের পাশে তুজনের বসার সিট। নীচে এসে দেখলাম তুপাশে কয়েকটা দোকান আছে। কিন্তু কোনও খাবার দোকান দেখলাম না। সকাল থেকে এক কাপ চা পর্যন্ত পেটে পড়ে নি। কাল রাতে ছয়-সাতটা প্রায় কাঁচা রুটি খাওয়া বোধহয় ঠিক হয়নি। শরীরটায় খুব জুৎ নেই। এ রাস্তায় পেট খারাপ হওয়া খুব বিপজ্জনক। তার ওপর আবার এখন যাচ্ছি সব থেকে বিপদসন্থূল স্থানে। লোকে বলে গোমুখ গোলে মানুষ নাকি আর ফেরেনা। ওখানে পৌঁছে ফিরে আসতে না পারলে তুঃখ নেই, কিন্তু পৌছনোর আগেই কিছু ঘটে গেলে মৃত্যুটা বড়ই তুঃখজনক ও লজ্জাকর হবে। তাই ঠিক করলাম তুপুরে কিছু খাব না। একটু পকোড়া ও এক কাপ চা খেয়ে বাসে উঠে বসলাম।

মনে মনে বেশ একটা আনন্দ অনুভব করছি। লক্ষা যাওয়ার বাস যখন পেয়ে গেছি, তখন গঙ্গোত্রী, গোমুখ পৌঁছেই গেছি বলা যায়। ক্রমে ক্রমে বেলা প্রায় বারটা বাজল। পিছনের দ্বিতীয় শ্রেণীর সিটে সেই সাধু গোছের লোকটা এসে উঠেছে। আরও উঠেছে একজন গেরুয়া রঙের ধুতি পাঞ্জাবী পরা সাধু, তার এক বাচ্চা শিষ্য ও বছর ত্রিশ-প্রত্রেশের একজন চেলা। মাধব ও দিলীপ ভাত রুটি যা পাওয়া যায়, খেতে গেল। আমি লম্বা সিটটায় চুপচাপ শুয়ে থাকলাম। পিছন থেকে গেরুয়াধারীর মাহাত্ম্য, তাঁর নিজের মুখেই শুনছি। ভীষণ বিরক্ত লাগছে। নিজেকে সে মহাত্মা বলে সম্বোধন করছে। অন্য সাধু গোছের লোকটা, তার কথায় সায় দিছে বটে, তবে বেশ বোঝা যাছে, সে গেরুয়াধারীর একটা কথাও বিশ্বাস করছে না। শুয়ে শুরেই শুনলাম, সাধু গোছের লোকটা গঙ্গোত্রী থেকে ফিরে যমুনোত্রী যাবে। আমি যমুনোত্রী সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করে বুঝলাম, ওই পথ সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। মাধব আর দিলীপ ফিরে এসেছে। ওরাও শুয়ে বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। গেরুয়াধারীর কথার ফুলঝুরি যেন বেড়েছে। সাধু গোছের লোকটাকে বোঝাছে যে জহরলাল নেহুক্বক বলেছিল, সে একটা অপদার্থ। তার দ্বারা দেশ চালানো সন্তব নয়। শুনে শুনে আমার মাথা গরম হয়ে যাছে। আমি ও দিলীপ তাকে একটু উসকে দিতেই জানাল, ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিল, "ইন্দিরা তোর দ্বারা দেশের কোন ভাল কাজ হবে না। তুই যা করছিস, তাতে তোর বিপদ হবে"। যা বুঝলাম, সে সুভাষ, গান্ধী, জহরলাল, সবাইকেই ভালভাবে চিনত এবং সবার সঙ্গেই তুই তোকারি সম্পর্ক ছিল। ভাবছিলাম, এবার কেনেডি, কার্টার বা ব্রেজনেভকে কী কী বলেছিল তার ফিরিস্তি দেবে। এবার বলল, একবার ধ্যানে বসে জানতে পারে যে তার মা প্রায় মৃত্যু শয্যায়। সাপে কেটেছে। ধ্যানেই মা-কে বাঁচাবার জন্য দেবতাদের স্মরণ নেয়। মা বেঁচেছিল কী না জানবার আর আগ্রহ নেই। এই মুহূর্তে কখন বাস ছাড়বে, সেটা জানার আগ্রহ আমার অনেক বেশি। তবু মনে হল ওর মা'কে সা'পেন। কেটেট, যদি ওকে কাটত, তাহলে ওর মা এবং আমরা, উভয়পক্ষই শান্তি পেতাম।

খেরে বসে কোমরে বাত ধরার উপক্রম। বাস থেকে নেমে খোঁজ নিতে গেলাম। জানা গেল গতকাল কোন বাস লঙ্কা যায় নি। এখানে বাসের তেল ভূখি থেকে খচ্চরের পিঠে বয়ে আনতে হয়। একটা খচ্চর এক বয়ারেলও তেল আনে না। তার জন্য ভাড়া দিতে হয়, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। তাছাড়া উত্তরকাশী থেকে ভূখি পর্যন্ত তেল বয়ে আনতেও বাস খরচ অনেক লেগে যায়। কাজেই পঁচিশ-ত্রিশজন প্যাসেঞ্জার না হলে বাস ছাড়বে না। গতকালও এই একই কারণে কোন বাস ছাড়ে নি। একজন আবার বলল, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, প্যাসেঞ্জার না হলেও, রোজ একটা অন্ততঃ বাস ছাড়ার কথা। খনে একটু আশার আলো দেখলাম। কোন কথাটা সতিয় আর কোনটা যে মিখ্যে বোঝার উপায় নেই। খনলাম লঙ্কা পর্যন্ত জীপও যায়। কিন্তু কোথাও কোন জীপের চিহ্ন দেখলাম না। আবার বাসে এসে বসলাম। একটু পরে সতিয়ই লঙ্কা থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে একটা জীপ এল। জানা গেল অন্তত ছয়জন প্যাসেঞ্জার না হলে, জীপ যাবে না। ভাড়া মাথাপিছু কুড়ি টাকা। বাসে ভাড়া নেয় দশ টাকা মতো। ইতিমধ্যে একজন যুবক এসে বাসে উঠেছে, যাবে হরশিল। দেখে মনে হল, এখানকার লোক নয়। প্যাসেঞ্জারের আশায় পথ চেয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও কাজও নেই। আমার বেশ খিদে পাছে এবার। মাধবকে নিয়ে গোলাম কিছু খাবারের সন্ধানে। ভাবলাম কয়েকটা বিস্কুট আর চা খেয়ে নেব। কোনও দোকানে বিস্কুট পেলাম না। কিন্তু সব দোকানেই অনেক রকম গায়ে মাখার সাবান আছে। এত সাবান এখানে কে মাখে বুঝলাম না! অনেক নীচে সমতল এলাকায়, গোটাকতক মিলিটারি ক্যাম্প। রাস্তার পাশে একটা কল থেকে অবিরাম জল পড়ে যাচেছ। শেষে একটা দোকানে বিস্কুটের প্যাকেট পাওয়া গেল। ফুকোজ বিস্কুট। প্যাকেটটা বৈরি হয়েছিল ভগবান জানেন। বাসের সেই মহাত্মা গেকয়াধারী জানলেও জানতে পারে! উপায় নেই, তাই-ই খেয়ে নিলাম।

এইভাবে বেলা তিনটে বেজে গেল। ঠিক করলাম আর অপেক্ষা না করে, জীপেই যাব। বাসের সেই নবাগত যুবকটি খুব আগ্রহ প্রকাশ করল। বাসে গিয়ে সাধু গোছের লোকটাকে, গেরুয়াধারী সাধু ও তার দুটো চেলাকে জীপে যাওয়ার কথা বললাম। ওরা পরিষ্কার জানাল এত ভাড়া দিয়ে জীপে যাবে না। বললাম বাস কবে ছাড়বে তার ঠিক নেই। বলল, ওদেরও কোন তাড়াহড়ো নেই, এখানেই দুটো চাল ভাল সেদ্ধ করে খেয়ে থেকে যাবে। রাগ হয়ে যাছে, কিন্তু প্রকাশ করলে চলবে না। কারণ ওরা না গেলে কিছুতেই ছজন খন্দের হছে না। বললাম, বাসে তো থাকতে দেওয়া হয় না, রাতে কোথাও থাকতেও তো পাঁচ-সাত টাকা খরচ হবে। তাছাড়া কবে বাস যাবে, তারও তো কোন ঠিক নেই। তাই রোজ থাকা খাওয়া বাবদ এত টাকা খরচ করার থেকে, দশটা টাকা বেশি দিয়ে জীপে চলে যাওয়াই লাভজনক। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়, কিছুতেই রাজি হল না। এইভাবে প্রায় সাড়ে তিনটে পর্যন্ত খন্দেরের আশায় কাটালাম। গতকাল ও আজ, দুদিনে মোট আটজন প্যাসঞ্জার জুটেছে। কাজেই পঁচিশ-ত্রিশজন যাত্রী যোগাড় হতে কতদিন লাগতে পারে হিসাব করে, মনস্থির করলাম যেভাবে হোক জীপেই যাব। একবার ভেবেছিলাম মিলিটারি ট্রাকে অনুরোধ করে লঙ্কা যাব। কিন্তু সাধারণ মানুষকে কখনও তাদের ট্রাকে জায়গা দেয় না জেনে সে অনুরোধ আর করি নি। শেষ পর্যন্ত অনেক বোঝাবার পরে, সাধু যুগল ও চেলাছয়, জীপে যেতে রাজি হল। সামনে ড্রাইভারের পাশে জায়গা নিয়ে বসলাম। আমার পাশে আর একটা বাচ্চা ছেলে কোথা থেকে এসে আসন দখল করল বুঝলাম না। তার পাশে, দরজার ধারে, যুবকটি





বসল। পিছনে মাধব, দিলীপ, তুই সাধু ও তুই চেলা। অবশেষে সব অশান্তির সমাপ্তি ঘটিয়ে, জীপ ছেড়ে দিল। ও মা, এবার দেখি এদিক ওদিক থেকে তু-একজন এসে জীপের পেছনে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল! রাস্তায় অজস্র গিরগিটি এদিক ওদিক ছুটে বেড়াছে। এখানে ওদের এত আধিপত্য কেন বুঝলাম না। একপাল ছাগল, ভেডা রাস্তায় চরে বেডাছে। অনেক চেষ্টার পর তাদের সরিয়ে, জীপ সামনে এগিয়ে চলল।

এইভাবে দেড় কিলোমিটার মতো পথ এসে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। বন্যার আগে রাস্তা যখন স্বাভাবিক ছিল, সমস্ত বাস, জীপ উত্তরকাশী-লঙ্কা যাতায়াত করতো। উত্তরকাশীতেই গাড়িগুলোর সার্ভিসিং বা মেরামতের কাজ হ'ত। বন্যার সময় ভাবরানীর দিকে পাঁচটা বাস ও দুটো জীপ ছিল। এগুলো আর রাস্তার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উত্তরকাশী যেতে পারছে না। ফলে গাড়িগুলো তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত মেরামত করে নিছে। মিলিটারিদের সঙ্গে এদের খুব সুসম্পর্ক, সেরকম বড কোন অসুবিধা হলে, মিলিটারিরা যথেষ্ট সাহায্য করে। জীপ মেরামত করতে করতে ড্রাইভার এসব তথ্য জানাল। যাহোক, ড্রাইভার ও যুবকটির চেষ্টায়, জীপ আবার সচল হয়ে অসংখ্য গিরগিটি, ছাগল ভেডাকে কাটিয়ে, নিজের রাস্তায় এগিয়ে চলল। পাশে গভীর খাদ। আরও দেড-দুই কিলোমিটার পথ পাডি দিয়ে জীপ আবার দেহ রাখল। ডাবরানী থেকে লঙ্কা ঊনচল্লিশ কিলোমিটার পথ। তিন-চার কিলোমিটার পথ পেরোতেই জীপ ত্ব-ত্ববার খারাপ হল। উল্টো দিক থেকে একটা মিলিটারি ট্রাক এসে দাঁড়াল। একজন মিলিটারি যুবক নেমে পড়তে, ট্রাকটা ডাবরানী চলে গেল। এই যুবকটির চেষ্টায় জীপ আবার প্রাণ ফিরে পেল। শুনলাম যুবকটি মিলিটারি ট্রাক চালায়। জীপ আবার এগিয়ে চলল। আরও খানিকটা পর্থ পাড়ি গিয়ে, ডাবরানী থেকে সাত কিলোমিটার দূরে আমাদের রথ আবার বিগড়ে গেল। রাস্তায় নেমে দাঁড়ালাম। জীপটাকে একবার পিছন দিকে, একবার সামনের দিকে ঠেলে অনেক চেষ্টা করেও তার হৃৎপিভ সচল করা গেল না। পাইপ দিয়ে তেল বার করে ড্রাইভার তার বৃদ্ধিমত অনেক চেষ্টা করল। ফল কিছ হল না। তখন আবার ঠেলে জীপের মখ ভাবরানীর দিক করে. ঢাল রাস্তায় জীপ গড়িয়ে অনেকটা রাস্তা পিছিয়ে এসে বার বার স্টার্ট নেওয়ার চেষ্টা করেও, কোনও সুফল পাওয়া গেল না। জীপেই মালপত্র, টাকা পয়সা ছিল, আমরা হেঁটে হেঁটে জীপের কাছে এলাম। ডাইভার জানাল ফিল্টারে ময়লা জমেছে। সে ফিল্টার খুলে রাস্তায় বসে পরিষ্কার করতে শুরু করল। শক্ত একটা কাঠি দিয়ে খুঁটে খুঁটে, কফি রঙের জমাট বাঁধা পাথরের মতো শক্ত ময়লা বার করে, পেট্রল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা হল। যে পরিমাণ পেট্রল নষ্ট হল, ভয় হচ্ছে যে জীপ চালু হলেও, তেলের অভাবে না ইঞ্জিন আবার বন্ধ হয়ে যায়। ড্রাইভার ও যুবকের চেষ্টায় ফিল্টারটা ঠিক জায়গায় লাগানো হল। আমাদেরও হেল্পারের কাজ করতে হল। কিন্তু এত কিছুর পরেও জীপ চালু করা সম্ভব হল না। ড্রাইভার তবু হাল ছাড়লনা, একটা পাইপ দিয়ে ট্যাঙ্ক থেকে আমাদের পল টানতে বলল। সম্ভবত সাইফন প্রক্রিয়ায় তেল বার করে কোন কাজ করবে। মুখ দিয়ে খুব জোরে টান দিতে আমার মুখ, জামা, প্যান্ট পেট্রলে ভিজে গেল। ড্রাইভার আমায় সাত্তনা দিয়ে বলল, পেট্রলে কাপড়ে দাগ পড়ে না। আর ভাল লাগছে না, হাল ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বসে পড়লাম।

এতক্ষণ চূপ করে বসে থেকে, গেরুয়াধারী আমায় বলল –"বাঙালিবাবু, যে সব কাজে তাডাহুডা করে, সে সফল হতে পারে না, পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না"। বললাম, তা হয়তো ঠিক, তবে যে চেষ্টা করে, সে পূর্ণতা অর্জন করলেও করতে পারে, কিন্তু যে বসে থাকে, তার ভাগ্যও বসে থাকে। তারপক্ষে কোনদিনই পূর্ণতা অর্জন সন্তব নয়। ড্রাইভার এখনও গাড়ি চালু করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। গেরুয়াধারী পকেট থেকে একটা ছোট বই বার করে পড়ার ভান করছে। মাঝেমাঝে কান, নাক, বুক, পেটে আঙ্গুল দিয়ে প্রণাম করছে। এদিকে ক্রমশঃ সন্ধ্যা নেমে আসছে, বুঝতে পারছি সামনে সমূহ বিপদ। গেরুয়াধারী এবার ড্রাইভারকে বলল, "আমি মহাত্মা, সব কাজ সময়মত করতে হয়। যে কাজে মন দেয় না, সময়মত কাজ করে না, তার কখনও উন্নতি হয় না"। এই মুহূর্তে এইসব জ্ঞানবাক্য অসহ্য মনে হচ্ছে, বিরক্ত লাগছে। ড্রাইভার বেশ অসম্ভষ্ট হয়ে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন, গাড়ি ঠিক হবেই।' গেরুয়াধারী উত্তরে বলল, 'এই জন্যই এই গাড়িতে আসতে চাইছিলাম না। বাঙালিরা বেশি চালাক, তাই নিজেরা এসে আমাদের বিপদে ফেলল। আমি মহাত্মা, আমি সব আগে থেকে বুঝতে পারি। কী বাঙালিরা, কতদুর পৌঁছলে? লঙ্কা পৌঁছে গেছ?' রাগে গা জুলে গেল। গালাগাল দিয়ে বললাম, 'তোমাকে সঙ্গে নেওয়াটাই আমাদের চরম ভূল হয়েছে। মাধব আমাকে এসব কথা বলতে বারণ করছিল। ড্রাইভার এবার বেশ কডা সুরে বলল, 'কথা না বলে একটু চুপ করে বসুন। গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে।' গেরুয়াধারী কিন্তু চুপ করে থাকতে নারাজ। সে দম নিয়ে নতুন করে বলতে শুরু করল, 'বাঙালিরা বেশি পণ্ডিত হয়, তাই ফল পাচ্ছে।' আমি আবার গালাগালি দিয়ে উঠলাম চটে গিয়ে। বলিহারি মাধবের সহ্যশক্তি! চুপ করে বসে কাজ দেখছে। গেরুয়াধারী আবার মুখ খুলতেই, দিলীপ হঠাৎ চুউউউউপ বলে চিৎকার করে ধমক দিতেই, ও কীরকম ঘাবড়ে গিয়ে মুখে কূলুপ এঁটে দিল। অবশেষে ড্রাইভার ঘোষণা করল, জীপ আর যাবে না। যুবকটি আর সাধুরা ঠিক করল শর্টকাট রাস্তায় হরশিলের দিকে হেঁটে যাবে। হরশিলের দূরত্ব কত তাও জানা নেই। তাছাড়া এই সন্ধ্যায় যাওয়া ঠিক হবে কী না, তাও বুঝতে পারছি না। যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম হরশিলে রাতে থাকা খাওয়ার জায়গা পাওয়া যাবে কী না। সে জানাল পাওয়া যেতে পারে। পাওয়া যাবেই কিন্তু বলল না। ড্রাইভারও সেরকম জোর দিয়ে কিছু বলল না। কী বিপদেই যে পড়লাম। ঠিক করলাম ডাবরানী ফিরে যাব। ওরা হরশিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।।



ড্রাইভারকে বললাম, ডাবরানীর দিকে তো ঢালু পথ, জীপ গড়িয়ে নিয়ে চল। সে জীপে উঠে বসল। আমরা তিনজনে জীপ ঠেলতে শুরু করলাম। ঢালু রাস্তায় জীপ বেশ গতি নিলে, লাফিয়ে উঠে বসলাম। আবার চড়াইয়ের রাস্তা এলে, জিভ বার করে জীপ ঠেলতে শুরু করলাম। আবার উতরাইয়ের রাস্তায় এসে জীপ অসম্ভব গতিতে গডাতে শুরু করলে, লাফিয়ে উঠে বসলাম। এইভাবে একবার ঠেলে, একবার দৌড়ে, একবার জীপে বসে আমরা পিছোচ্ছ। সবাই গাড়ি নিয়ে এগোয়, আমরা পিছোচ্ছি! এইভাবে একসময় অনেকটা রাস্তা উতরাই পাওয়া গেল। জীপ অসম্ভব গতিতে এগিয়ে চলেছে। অনবরত বাঁক। আমার একটাই চিন্তা, জীপে কোন হর্ন নেই। উল্টোদিক থেকে মিলিটারি ট্রাক আসলে চোখের নিমেষে খাদে চলে যাব। মাধবকে অফিসের কাজে গাড়ি করে অনেক ঘুরতে হয়। কাজেই ওর ধারণা থাকতে পারে ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, ইঞ্জিন বন্ধ থাকলে ব্রেক কাজ করে কিনা। ও বলল, এ বিষয়ে ও নিশ্চিত যে কাজ করে। গলার ঝোলা ব্যাগ সিটে রেখে, জীপের

বাইরে একটা পা ঝুলিয়ে, রেডি হয়ে বসলাম। প্রয়োজনে যাতে সহজেই লাফিয়ে নেমে পড়তে পারি। যাহোক, কোন বিপদ না ঘটিয়ে জীপ রাস্তার একপাশে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার বলল, জীপ আর যাবে না। এখান থেকে ডাবরানী প্রায় চার কিলোমিটার পথ। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটতে শুক্ত করলাম। একসময় ডাবরানী ফেরত চলে এলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সারাদিনের নেট লাভ, অন্তত পাঁচজন যাত্রীকে হারানো। অর্থাৎ আমাদের তিনজনকে বাদ দিয়ে কাল আবার সতেরো থেকে বাইশজন নতুন যাত্রী যোগাড় করা। ডাবরানীতে এসে একটা দোকানে বুদ্ধি সিং-এর খোঁজ করলাম। যে ডদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন আপনারা ঠিক জায়গায় এসেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম— "আপনার নামই কী বুদ্ধি সিং"? উত্তরে বললেন যে তিনি বুদ্ধি সিং নন। বললাম, আমরা উত্তরকাশী ট্রাভেলার্স লজে বুদ্ধি সিং-এর নাম শুনে এসেছি। আজ রাতে আমাদের থাকার জন্য তিনটে খাটিয়া, লেপ, তোষক চাই। ভদ্রলোক যেন বিনয়ের অবতার। একগাল হেসে বললেন, আপনারা একটু কষ্ট করে বসুন। বুদ্ধি সিং এখনই এসে সব ব্যবস্থা করে দেবেন। একটু পরেই ভদ্রলোক সামনে একটা বড় তাঁবু দেখিয়ে বললেন, এখানে কষ্ট করে না বসে, আপনারা তাঁবুতে গিয়ে বিশ্রাম নিন। আমরা তাঁর কথামত তাঁবুর ভিতরে গিয়ে দেখলাম, দুটো সারিতে পরপর অনেকগুলো খাটিয়া পাতা। আরও বেশ কয়েকটা দাঁড় করানো আছে। একদিকের রো-তে পরপর দুটো খাটিয়ায়, এক বয়ন্ধ স্বামী-স্ত্রী জায়গা নিয়েছেন। অপর দিকের রো-তে পরপর তিনটে খাটিয়ায়, আমরা তিনজনে জায়গা দখল করে বসলাম। বুদ্ধি সিং হাজির হলেন। আমরা তাঁকে উত্তরকাশীর কথা বললাম। তিনি তুহাত তুলে নমন্ধার করে বেশ নতুন ধবধবে সাদা কভার লাগানো লেপ, তোষক বার করে দিলেন। এত আরামে এখানে থাকা যাবে স্বপ্নেও ভাবি নি। বুদ্ধি সিং বললেন, 'নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন, কোনও চিন্তা করেনেন। । তাল করেলানাভাও করা হয়েছে। এ জায়গায় এটাকে রীতিমত গ্রান্ড হোটেল বলা চলে। নিজেদের খাটিয়ায় বসে অপর দিকের ওই স্বামী-স্ত্রীর সাথে আলাপ করলাম। আজ লঙ্কা থেকে আমাদের যে অভিশপ্ত জীপটা এসেছে, ওই জীপেই তাঁরা লঙ্কা থেকে এসেছেন। ভদ্রলোক বললেন, খুবে সাস্থ্য বাধ করছেন। পায়ের জুতো থেকে অনেকগুলো ফোন্ধা হয়ে ঘেরে গেছে। বললাম, এক সাইজ বড় জুতো কেনা উচিত

ছিল। জায়গাগুলো তাল করে পরিষ্কার করে, ওযুধ লাগাতেও বললাম। তদ্রলোক ওযুধ খেয়ে, তাল করে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। থাকেন বোম্বাই শহরে। ব্যবসা করেন। অমরনাথ হয়ে গঙ্গোত্রী গোমুখ গিয়েছিলেন। অমরনাথের আগেও অনেকগুলো জায়গা ঘুরে এসেছেন। যদিও সব জায়গাতেই ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখান থেকে যমুনোত্রী যাবেন। আরও অনেকগুলো জায়গা যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। বললেন, বিয়াল্লিশ দিন হল বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। কথাবার্তায় বোঝা গেল ভদ্রলোক অগাধ পয়সার মালিক, তবে দেশ ভ্রমণের ইচ্ছাও যথেষ্ট। ভদ্রলোককে গঙ্গোত্রী, গোমুখের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। বললেন, প্রথম দিনই এখান থেকে লঙ্কাগামী বাস পেয়েছিলেন। লঙ্কা থেকে গঙ্গোত্রীর জীপও পাওয়া যাবে। মনে মনে ভাবলাম, আমরাই বোধহয় ঘোর পাপী, তাই ওই রকম একজন সাধুসঙ্গেও কাজ হয়নি। বললেন, গোমুখ যেতে হলে, গঙ্গোত্রী পুলিশ স্টেশনে নাম, ঠিকানা ইত্যাদি লিখে, তবে যেতে দেওয়া হচ্ছে। একজন পান্ডার সঙ্গে এক ভদ্রলোক গোমুখ গিয়েছিলেন। তাঁদের কোন খোঁজ পাওয়া যাছে না। রাস্তা খুব কষ্টকর। ভূজবাসার লালবাবার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, ওই রকম একজন মানুষ তিনি জীবনে কোনদিন দেখেন নি। অতিথিদের দেবতাজ্ঞান করেন। বললেন, প্রথমে লালবাবার ওপর ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে লালবাবার আশ্রমে পৌঁছলে, লালবাবা তাঁদের অনেকটা করে চা খেতে দেন। কোনদিন চা পান করেন না, তাই তাঁরা চা খেতে রাজি হননি। তখন লালবাবা বলেন, চা খেলে শরীর ভাল থাকবে। এরপরও চা খেতে অস্বীকার করলে, লালবাবা বলেন, চা পান না করলে এখানে তাঁদের থাকতে দেওয়া হবে না। ফলে বাধ্য হয়ে চা পান করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, এবং বেশ সুস্থও বোধ করেন। লালবাবা তখন বলেন, এত কষ্ট করে এখানে আসার পর গরম চা পান করলে শরীর অনেক সুস্থ হয়ে যায়। তাই তাঁদের জোর করে চা পান করানো হল। রাতে তাঁদের অনেকগুলো রুটি খেতে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা রুটি কমিয়ে দিতে বললেও, কমানো হয়নি। ওখানে অত কষ্ট করে অত মল্যবান খাবার নিয়ে যাওয়া হয়, তার জন্য কোন দাম পর্যন্ত নেওয়া হয় না। ফলে রুটি ফেলে দিতেও পারছেন না। ওখানে ভীষণ ঠাণ্ডা, তাঁর স্ত্রী লালবাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, রাতে ক'টা কম্বল পাওয়া যাবে। উত্তরে তিনি বলেন, যতগুলো রুটি খাবে, ঠিক ততগুলো কম্বল। বাধ্য হয়ে ইচ্ছা না থাকলেও তাঁরা চার-পাঁচটা করে রুটি খেয়ে নেন। রাতে কিন্তু তিনি অনেকগুলো করে কম্বল পেতে শোওয়ার ও গায়ে দেওয়ার জন্য দিয়ে বলেছিলেন, এখানে আসার পর বেশীরভাগ যাত্রীই পথশ্রমে রাত্রে না খেয়ে শুয়ে পড়তে চান। খালিপেটে এতবড় রাত কাটালে শরীর খারাপ হবেই, তাই তাঁকে ভয় দেখিয়ে খাবার নিয়ে জোর করতেই হয়। তীর্থযাত্রীদের সৃষ্ট রাখার জন্য সব সময় চিন্তা করেন। ভদ্রলোক ওখানে একজনের কাছে শুনেছেন যে, কারো পায়ে খুব বেশি ব্যথা হলে, তাকে সুস্থ করার জন্য লালবাবা নাকি পা পর্যন্ত টিপে দেন। যাহোক, এবার ভদ্রলোক আমাদের পরামর্শ দিলেন যে, আমরা যেন ওখানে পৌঁছেই তাঁকে জানাই যে আমরা খেয়ে এসেছি এবং শরীরও ভাল নয়, কাজেই খুব অল্প করে খাব। খেতে বসে শরীর খারাপ বললে তিনি বিশ্বাস করবেন না। এত কথা শুনে লালবাবাকে দেখবার খুব ইচ্ছাও হল। দিলীপ ও মাধব জিজ্ঞাসা করল, ভূজবাসা থেকে গোমুখ যাবার জন্য গাইড নিতে হবে কিনা। বললাম, বছর দুই আগে আমার পরিচিত একজন গোমুখ গিয়েছিল, সে বলেছে গাইড নেবার প্রয়োজন হয় না। ভদ্রলোকও বললেন, শেষ আধ মাইল কোন রাস্তা নেই বটে, তাহলেও নিজেরাই যাওয়া যায়। গাইডের প্রয়োজন হয় না। যাহোক, তখনকার মতো কথা থামিয়ে তাঁবুর বাইরে এলাম।

দোকানে এসে দেখি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন আদিবাসী গোছের পুরুষ ও নারী একটা পালকির মতো কী নিয়ে ওই দোকানে এসে উঠেছে। তুটো লাঠির মাঝখানে পালকির আকারের একটা মন্দিরের মতো ঘর। তার মধ্যে কিছু একটা দেবদেবীর মূর্তি আছে। স্থানীয় কোন গ্রাম থেকে ওরা এখানে এসেছে, যাবে গঙ্গোত্রী। দেখলাম দোকানে বসে বেশ কয়েকজন হালুয়া তৈরি করছে। ওই দেবতার প্রসাদ। দোকানদার জানাল, ইচ্ছা করলে আমরাও খেতে পারি। ভাবলাম খেয়ে দেখলাম দোকানে বসে বেশ কয়েকজন হালুয়া তৈরি করছে। ওই দেবতার প্রসাদ। দোকানদার জানাল, ইচ্ছা করলে আমরাও খেতে পারি। ভাবলাম খেয়ে দেখলে মন্দ হয় না। এটা তো মানতেই হবে, ইনি যে দেব বা দেবীই হন না কেন, অত্যন্ত জাপ্রত। যাত্রীর অভাবে আমরা ভয়রুর বিপদ ও শোচনীয় কস্তের মধ্যে আছি জানতে পেরেই, প্রয়োজনীয় সংখ্যার বেশীই লোকজনকে গঙ্গোত্রী পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আগামী কাল আমাদের লঙ্কা যাওয়া কে আটকায়? খাবারের অর্ডার দিয়ে, দোকানদারকে আগামী কালের বাসের খোঁজখবর দিতে বললাম। সে বলল, পরপর তুদিন কোনও বাস যায়িন, কাজেই কাল নিশ্চয় বাস ছাড়বে। বললাম, এরা সবাই গঙ্গোত্রী গেলে, প্যাসেঞ্জারের তো অভাব হবার কথা নয়। দোকানদার বলল, এরা স্থানীয় মানুয়, সবাই হেঁটেই যাবে। ব্যস, বাড়া ভাতে ছাই হয়ে গোল। আমাদের মুয়ড়ে পড়তে দেখে, সে আশ্বাস দিয়ে বলল, আগামী কাল পঁচিশ-ত্রিশ বস্তা ময়ুয়া ও চার-পাঁচ টিন ডালভা নিয়ে যাওয়া হবে, ফলে বাস ছাড়বেই। প্যাসেঞ্জারের বদলে ময়ুয়া ও ডালভা? সবই কপাল। যা খুশি, যে খুশি যাক, বাস গোলেই হল। তাঁবুর ভদ্রলাক বলেছিলেন রাতে তিনি কিছু খাবেন না। আমরা খেতে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে গোলে,খুব উপকার হয়। ডাকতে গিয়ে গুনলাম, তাঁবুতেই খাবার দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। দোকানে ফিরে গোলাম। সেই একঘেয়ে রুটি আর আলুর তরকারি, সঙ্গে অবশ্য ডাল আছে। হালুয়া আর খোলাম না। একবার ভেবেছিলাম অন্য একটা দোকান থেকে পরোটা কিনে খাব। শেষ পর্যন্ত তা আর খাওয়া হল না। তাঁবুতে ফিরে এসে একটু গলপগুজব করে গুয়ে পড়লাম। আজ আমরা সতিই বড় ফুান্ত। তার ওপর এত আরামে এ পথে ঘুমোবার কথা ভাবতেও পারিন। আগে ভাবরানীতে কেউ নামতোও না। বন্যার পর সবাইকে ভাবরানী আসতেই হবে, আর প্যাসেঞ্জারের অভাবে বাস না পেলে তু-এক রাত থাকতেও হবে। ফলে বুদ্ধি সিং বুদ্ধি করে খাসা ব্যবসা খুলে বসেছেন। অবশ্য ব্যবস্থাও খুবই ভাল করেছেন। সব থেকে বড় কথা খুব পরিয়র বাস বা প্রেমান পরিছয়, যেটার এপথে খুবই অভাব।

আজ উনত্রিশ আগষ্ট। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে, বুদ্ধি সিংকে তাতাঁবু ভাড়া বাবদ বারো টাকা মিটিয়ে দিয়ে একবার বাইরে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসবো ভাবছি, বুদ্ধি সিং বললেন, যতক্ষণ না বাস ছাড়ে এখানেই বিশ্রাম নিন। বাস ছাড়লে এখান থেকে বাসে উঠে পড়বেন।

বাস ছাড়ার কিন্তু কোনও লক্ষণ দেখছি না। ভোরবেলা সেই ত্রিশ-চল্লিশ জনের আদিবাসী দলটা গঙ্গোত্রীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। জানা গেছে গতকালের সেই বাসটাই যাবে। বাসে গতকালের মতো একেবারে সামনে জায়গা রেখে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি। চায়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ করলাম। জানতে পারলাম, একটু অপেক্ষা করে দেখা হবে, যদি ভূখি থেকে কোন প্যাসেঞ্জার আসে। তবে বাস আজ যাবেই, কোন সন্দেহ নেই। গতকাল যখন জীপ খারাপ হওয়ায় হেঁটে হেঁটে ফিরছিলাম, মাধব ও দিলীপের কথাবার্তায় বুঝতে পারছিলাম, ওদের বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ওদের আর এবার যাওয়ার ইচ্ছা নেই। গতকাল বাসে যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখনও ওরা সেইরকম একটা আভাস দিয়েছিল। যে কারণে আমি সাধু গোছের লোকটাকে যমুনোত্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলাম। যাতে আমার কথায় ওরা বুঝতে পারে, আমি গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী যাবই। জানি যে, আমাকে ফেলে ওদের পক্ষে ফিরে যাওয়া খুব মুশকিল। ওরা চাইছে আমি নিজে থেকে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবটা পেশ করি। গতকাল হেঁটে হেঁটে ফিরবার পথে দিলীপ আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি কী করব? শুনে ভীষণ রাগ হয়ে গিয়েছিল। মাধব একে ফিরে যাব ফিরে যাব করছে, তার ওপর ও আবার মাধবের সাথে পোঁ ধরেছে। বলেছিলাম, "আমি তোদের মতো অত সহজে ভেঙে পডতে বা হাল ছেডে দিতে শিথি নি। তোরাও তো আসবার সময় বলেছিলি, যতক্ষণ টাকা থাকবে ও শরীর ঠিক থাকবে, ততক্ষণ সবকটা জায়গা না দেখে ফিরবি না। এখনও পর্যন্ত সব জায়গা সহজ ভাবেই ঘোরা গেছে। এখনও এমন কিছু ঘটেনি, যে এর মধ্যেই ভেঙে পড়ে ফিরে যাবার চিন্তা করতে হবে। আমাদের হাওড়া-কলকাতাতেও মাঝ রাস্তায় বাস খারাপ হলে, সব প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর এখানে তো এমন হতেই পারে"। দিলীপ মাধবকে উদ্দেশ্য করে বলল, সে ইন্টারেস্ট পাচ্ছে না। মাধব কী করবে তাও জানতে চাইল। মাধব এবার আমায় জিজ্ঞাসা করল আমি কী করব? আমি সরাসরি উত্তর দিলাম, "এক কাজ কর। আমায় কিছু টাকা দিয়ে, তোরা বরং ফিরে যা। আমার বাড়িতে একটা খবর দিয়ে দিস। আমি শেষ চেষ্টা না করে ফিরব না, আর এটাই আমার শেষ কথা"। চোখের সামনে লঙ্কা, গঙ্গোত্রীর মাইল স্টোন দেখতে পাছি। দেখতে পাছি দূরতু, মাত্র উনচল্লিশ কিলোমিটার। মনে মনে রাগের মাথায় ঠিক করে ফেললাম, ভবিষ্যতে যেখানেই যাই না কেন, দিলীপকে আর সঙ্গে নেওয়া নেই। কোথায় ও এই মুহূর্তে আমার পাশে থেকে মাধবকে মনোবল যোগাবে, উৎসাহ দেবে, তা না, বরং উসকে দিচ্ছে ফিরে যাবার জন্য। মাধবকে খব ভালভাবে বোঝালাম যে. আর একটু কষ্ট করলে চরম ফল আমরা লাভ করবই। সে যেন একটু ধৈর্য ধরে আমার পাশে থাকে। পরে এ কষ্ট আর থাকবে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাধব বলল, আমার সঙ্গে বাকী জায়গাণ্ডলো যেতে রাজি আছে।

মনে মনে বাস ছাড়ার জন্য প্রার্থনা করছি। আজও যদি বাস না যায়, তাহলে ওদের সঙ্গে রাখা সত্যিই কঠিন হবে। অবশেষে অনেকগুলো, প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বস্তা আটা বা ময়দা ও পাঁচ-ছয় টিন ডালডান সত্যিই বাসের ছাদে ও ভিতরে তোলা হল। ওঃ! কী আনন্দ, কী শান্তি যে পেলাম বলে বোঝাতে পারব না। বাসের মুখ ঘুরিয়ে লঙ্কার দিকে করা হল। ড্রাইভার আবার বাস থেকে নেমে চলে গেল। আরও তুকাপ করে চা শেষ করলাম। অবশেষে বাস সত্যিই ছাড়ল! আজ দেখলাম কিছু প্যাসেঞ্জারও হয়েছে। ড্রাইভারের পাশেই আমি বসেছি। আমার পাশে বাসেরই একজন কর্মী। আমার ঠিক পিছনের সিটে, ড্রাইভারের পিছনে মাধব ও দিলীপ। মাঝোমাঝেই বাসটায় কী রকম একটা বিশ্রী আওয়াজ হছে। মনে হছে ইঞ্জিন বোধহয় বন্ধ হয়ে যাবে। ভয় হল, গতকাল জীপ ঠেলেছি, আজ বাস ঠেলতে হলে আর বাঁচব না। আগে হলুদ রঙের ছিল, বর্তমানে প্রায় কালো রঙের গায়ের মোটা গেঞ্জি ও সোয়েটারটা প্যান্টের ভিতর গুঁজে পরতে হছে। এই কন্দিনেই কোমর এত সরু হয়ে গেছে যে, তা নাহলে প্যান্ট নেমে আসছে। তিনজনের বাস ভাড়া বাবদ একত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মিটিয়ে দেওয়া হল। অবশ্য তার জন্য কোনও টিকিট পেলাম না। সেই গিরগিটি, ভেড়া ও ছাগলের পাল কাটিয়ে, গতকালের রাস্তা দিয়ে বাস এগিয়ে চলল। ড্রাইভার অনবরত গিয়ার চেঞ্জ করছে এবং গিয়ারের রডটা বারবার আমার পায়ে বেশ জোরে জোরে আঘাত করছে। বাধ্য হয়ে গিয়ারের তুদিকে তুটো পা রেখে প্রথম শ্রেণীর সিটে কষ্টেস্টে বসে আছি। আচমকা গিয়ারের রডটা নীচের দিকে নামাতে আমার হাতে লেগে খানিকটা কেটে রক্ত পড়তে শুরু করল।

হরশিল এসে বাস দাঁড়াল। সেই ত্রিশ-চল্লিশজনের আদিবাসী দলটা এখানে এসে হাজির হয়েছে। একটা গাছে কুলের মতো কী একটা ফল অসংখ্য ফলে আছে। ওরা পাথর ছুড়ে ওগুলো পাড়ছে আর টপাটপ মুখে পুরছে। আমার পাশে বসা বাসের লোকটাও, বাস থেকে নেমে ওগুলো পাডতে গুরু করে দিল। আমি দুটো ফল চাইতে. সে অনেকগুলো ফল আমার হাতে দিয়ে গেল। টক টক, কষা কষা খেতে। আদিবাসী দলটা এবার ঠিক করল, এখান থেকে এই বাসেই লঙ্কা যাবে। আগে, সকালে এটা ঠিক করলে, এতটা সময় নষ্ট হ'ত না। এত লোকের বাসে জায়গা হবে না - ড্রাইভার জানাল। দু'দিন পরে বাস ছেডেছে বলেই বোধহয়. আসবার পথে ভালই প্যাসেঞ্জার হয়েছে। ওরা কিন্তু ড্রাইভারের কথায় কান না দিয়ে, বাসের ভিতরে ও ছাদে উঠে পডল। পালকির মতো জিনিসটা, বাসের ভিতরে ঢোকানো হল। বাস ছেড়ে দিতেই ভেঁপু,



শিঙ্গা, ঢোল, ব্যান্ড পার্টির বাঁশীর মতো দেখতে কী একটা জিনিস, একসঙ্গে বাজাতে শুরু করে দিল। ওই ভিড়ে কানের কাছে শিঙ্গার বীভৎস আওয়াজ, বিডির ধোঁয়া, সে এক নরক যন্ত্রণা। এক জায়গায় বাস দাঁড করিয়ে, ইঞ্জিনে অনেক জল ঢালা হল। ভাগ্য আমাদের খুব ভালই বলতে হবে, নতুন কোনও বিপদ না ঘটিয়ে, বাস লঙ্কায় এসে পৌঁছল। আমরা নামতেই, ডাবরানীর দিকে যাওয়ার জন্য লঙ্কায় যে ক'জন প্যাসেঞ্জার ছিল, তাদের নিয়ে বাস ভাবরানীর উদ্দেশ্যে চলে গেল। শুনলাম কোন বাস বা জীপকে লঙ্কায় থাকতে দেওয়া হয় না, তারাও লঙ্কায় থাকতে চায় না। প্যাসেঞ্জার না পেলেও, এখানে বাস আসার সঙ্গে সঙ্গে ডাবরানী ফিরে যায়। ভয় হল ফিরবার সময় আবার বাস পাব তো? কবে ডাবরানীতে প্যাসেঞ্জার জমা হবে, বা ডালডা, ময়দা ইত্যাদি লঙ্কায় নিয়ে আসা হবে, তবে বাস লঙ্কায় আসবে। আবার বাস আসার শুভ মুহূর্তটাতে আমাদের লঙ্কায় উপস্থিত থাকতে হবে, তা নাহলে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে, বাস ডাবরানী ফিরে যাবে। এ এক কঠিন অঙ্ক। ছোট্ট জায়গা। পরপর দুটো মিষ্টির দোকান-কাম-হোটেল। ভাত, ডাল, তরকারি খেয়ে নিলাম। পালকির মতো জিনিসটাকে কাঁধে নিয়ে ওই দলটাও এদিকে এল। কেউ পয়সা দিয়ে নমস্কার করলে, ঝাঁকিয়ে কাত করে ওই ব্যক্তির বুকে বা মাথায় পালকির মতো মন্দিরটাকে ঠেকানো হচ্ছে। যেন দেবতা নিজেই কাত হয়ে আশীর্বাদ করছেন। এখান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে ভৈরবঘাঁটির চড়াই পার হতে হবে। শুনেছি খুবই কষ্টকর চড়াই। আস্তে আস্তে পথ চলতে শুক করলাম। এই মুহুর্তে রাস্তা খুব কষ্টকর বলে মনে হচ্ছে না। তবে ভাত খাওয়ার পরেই হাঁটতে তো একটু কষ্ট হবেই। চারপাশে একই দৃশ্য, এই সব দৃশ্য আর নতুন করে কী দেখব? ক্রমে মালুম পেতে শুক করলাম, কত কষ্টের এই চডাই। ধীরে ধীরে একসময় এই চডাই পার হয়ে, আমরা ভৈরবঘাঁটী এসে পৌছলাম। রাস্তার শেষে একটা বোর্ড দেখলাম। তাতে হিন্দীতে লেখা "কষ্টকে লিয়ে ধন্যবাদ"। এ কীরকম তামাশা বুঝলাম না! এত কষ্টের পর, কষ্টের জন্য শুধু শুকনো ধন্যবাদ জানানো! এতদিনে আমাদের প্রতি ভাগ্যদেবতা বোধহয় প্রসন্ন হয়েছেন। ভৈরবঘাঁটী থেকে গঙ্গোত্রীর জীপ শুধু পাওয়াই যায় তা নয়, একটা জীপ কয়েকজন যাত্রী নিয়ে বোধহয় আমাদের জন্যই অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা উঠতেই জীপ ছেড়ে দিল। তিনজনের ভাড়া লাগল, আঠারো টাকা। মাত্র নয়-দশ কিলোমিটার পথ, দেখতে দেখতেই আমরা গঙ্গোত্রী পৌঁছে গেলাম।



একটু ওপরে ট্রাভেলার্স লজে আঠারো টাকা ভাডায়, একটা তিন বিছানার ঘর ভাডা নিলাম। স্থানীয় পান্ডারা অবশ্য তাদের ঘরে থাকতে অনেক অনুরোধ করেছিল। একটু আরামে থাকার আশায় ট্রাভেলার্স লজই বুক করলাম। আমরাই একমাত্র বোর্ডার। তিনটে খাট, গোটা ছয়েক কম্বল দেওয়া আছে। মাধবের আবার সামান্য জুর এসেছে। পথে একবারও ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ খায়নি। ওকে এক ডোজ ওষুধ খাইয়ে, আমি আর দিলীপ বাইরে এলাম। চারদিকে খুব আরামদায়ক রোদ্দুর। একটু নীচেই বাঁদিকে গঙ্গোত্রী মন্দির। এখান থেকে মন্দিরের পিছন দিকটা দেখা যায়। মন্দিরের সামনে, দূরে বরফ ঢাকা শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। একবারে ডানদিকে সুদর্শন শৃঙ্গ, তার বাঁ পাশে কালো, একটু বাঁকা মতো গণেশ শৃঙ্গ। কয়েকটা ছবি নিয়ে, পোষ্ট অফিসের খোঁজে গেলাম। উত্তরকাশী থেকে অফিসের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে এনেছিলাম। ছুটি বাডাতে হবে। ভাবলাম আন্ডার সার্টিফিকেট অফ্ পোষ্টিং করে পাঠাব। মন্দিরের ডানদিকে ব্রিজ পেরিয়ে পোষ্ট অফিস। একটা বেঞ্চে বসে এক ভদ্রলোক পরম নিশ্চিন্তে উল বুনছেন। আর কাউকে দেখলাম না। মনে হয় এই একজনই পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল-কাম-পিওন। ছোট্ট অন্ধকার একটা ঘরে অফিস। অপর একটা ঘরে সম্ভবত তাঁর থাকার ব্যবস্থা। তাঁকে দুটো আন্ডার সার্টিফিকেট অফ পোষ্টিং এর ফর্ম দিতে বললাম। বললেন, ওই ফর্মের কথা তিনি আগে কখনও শোনেননি, এবং জানেনও না। অনেকভাবে তাঁকে বোঝাবার পর,

উল বোনা ছেড়ে অফিস ঘরে ঢুকে, কোনও বার পার্শেল ফর্ম, কোনও বার আবার অন্য কোন ফর্ম নিয়ে আসেন। এতো মহা বিপদ! কোনও ফর্মটাই আমাদের পছন্দ হচ্ছেনা দেখে, তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। শেষে তুটো ভাঁজ করা, প্রায় পাঁপড় ভাজার মতো মড়মড়ে, লালচে রঙের ফর্ম নিয়ে এসে বললেন, এই তুটো ফর্মই আছে, আর কোনও রকম ফর্ম এখানে পাওয়া যাবে না। এই ফর্ম তুটোই আমাদের প্রয়োজন। রঙ বদলে গেলেও কাজ চলে যাবে। তবে সোজা করে, যাতে ভাঁজ না পড়ে, সেইভাবে যতু করে রাখতে হবে। ফর্ম ভর্তি করে ভদ্রলোকের হাতে দিলাম। এবার বললেন, ইংরেজি পড়তে পারেন না। বললাম, আমরা পড়ে দিচ্ছি, দরকার হলে তিনি মিলিয়ে নিতে পারেন। এবার পরিষ্কার জানালেন, এভাবে করা তাঁর পক্ষে সন্তব নয়। বাধ্য হয়ে বললাম, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী, আমাদের সঙ্গে আইডেন্টিটি কার্ড আছে। এবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাকটিকিট লাগিয়ে, ওই ডাকঘরের ছাপ মেরে দিয়ে, বাইরের ডাক বাক্সে ফেলে দিতে বললেন। আমরা ডাকবাক্সে চিঠি তুটো ফেললাম কিনা, তিনি সেটাও ঘাড় বেঁকিয়ে লক্ষ্য করলেন। একেই বোধহয় জাতে মাতাল, তালে ঠিক' বলে। চিঠি পোষ্ট করে এক চক্করে মন্দির ঘুরে দেখে, ঘরে ফিরে এলাম।

মাধব ঘুমোচ্ছে। গায়ে এখনও জুর আছে। আমরাও রেষ্ট নেবার জন্য শুয়ে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজায় কড়া নেড়ে কে একজন আমাদের ডাকতে, খুলে দেখি ট্রাভেলার্স লজের একজন কর্মী। বললেন, "এই তো পাহাড় দেখার সময়, আপনারা ঘরে গুয়ে আছেন"? বাইরে এসে দেখি, সূর্যান্তের আভা বরফের ওপর পড়ে লাল-হলুদ রঙ ছড়াচ্ছে। ঘর থেকে মাধবকে ডেকে আনলাম। কর্মীটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে, দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে অনেকক্ষণ ওই দৃশ্য উপভোগ করলাম। অন্ধকার না নামা পর্যন্ত ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করল ना। कित्र এসে মাধবকে একা রেখে, টাকা নিয়ে নীচের দোকানে রাতের খাবারের অর্ডার দিতে গেলাম। চা খেয়ে, রাতের পুরী তরকারি ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলে ফিরে এসে দেখি, ঘর অন্ধকার, মাধব দরজা খলে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ওকে ডেকে দিলাম। লজের লোক একটা হ্যারিকেন দিয়ে গেল। এখানে বিদ্যুৎ নেই। একটু জলেই হ্যারিকেনটা দপ দপ করে নিভে গেল। দেখলাম হ্যারিকেনে যথেষ্টই তেল আছে। আবার জাললাম। কিছুক্ষণ ভালভাবে জुल, मुश्रम् करत जावात निष्ण शाना वार्रेस शिरा वाँ পাশে কর্মীটির ঘর থেকে অন্য একটা হ্যারিকেন বদলে



আনলাম। কিন্তু আশ্চর্য, এটাও সেই একই ভাবে নিভে যাছে। দিলীপকে বললাম হয়তো অক্সিজেনের অভাব। কাচটা খুলে দিয়ে জাললাম, তাতেও কোন লাভ হল না। ঘর অন্ধকার রেখেই চুপ করে শুয়ে থাকলাম। একটু পরে আমি আর দিলীপ আরতি দেখতে মন্দিরে গেলাম। ঘরে ফিরে এসে আবার শুয়ে আছি, খাবার আর দিয়ে যায় না। শেষে নিজেরাই খাবার আনতে যাব বলে তৈরি হচ্ছি, দোকানদার কী একটা পাতা করে একগাদা পুরী তরকারি দিয়ে গেল। তাকে প্রশ্ন করে জানলাম, ওটা ভূজপাতা।

এ রাস্তায় দেখেছি মোমবাতি অনেকক্ষণ জূলে। যে মোমবাতি কলকাতায় এক ঘণ্টা জূলে, সেটা এসব জায়গায় স্বচ্ছন্দে দেড়- দুঘণ্টা জূলবেই। একটা মোমবাতি জেলে, কোনরকমে অল্প কয়েকটা পুরী খেয়ে, বাকীগুলো রেখে দিলাম। মাধবতো মাত্র দুটো পুরী খেল। দিলীপ বলল, আগামীকাল রাস্তায় কাজে লাগবে। আমরা কিন্তু তাতে রাজি হলাম না। ঠিক হল, কাল সকালে নতুন পুরী, তরকারী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে। এগুলোও ফেলে না দিয়ে সঙ্গে রাখা হবে, দরকার হলে কাজে লাগানো যাবে। দোকানদার এতক্ষণ আর কিছু লাগবে কী না জানার জন্য, বসে বসে কথা বলছিল। তাকে সেইমতো অর্ডার দিয়ে, দরজা বন্ধ করে, কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। পান্ডাদের বাড়িতে না থেকে, এখানে উঠলাম একটু আরাম খোঁজার জন্য। কিন্তু বিছানায় এত পিসু, ভাবা যায় না। নাক, কান, গলা সর্বত্র হৈটে হৈটে গিয়ে, শরীরের বিশেষ বিশেষ পছন্দের জায়গাগুলো রক্ত চোষার জন্য বেছে নিয়ে, জ্বালিয়ে দিল। হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেললে বোধহয় চামড়া বা লোমকূপের সাথে লেপ্টে থাকছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে, পরিবেশ আবার শান্ত হলে, আবার আমাদের মতোই পথ পরিক্রমায় বার হচ্ছে। শুয়ে শুয়ে গুয়ে ঠিক করলাম, আজ এত রাতে আর কিছু করার নেই, তবে ফেরার সময় গঙ্গোতীতে থাকতে হলে, এখানে আর নয়। এর থেকে লালাজীর দোকানের পিসুরা অনেক ভদ্র, অনেক নির্লোভ ছিল। এদের আমাকে এত বেশি কেন পছন্দ, এরাই জানে। মাধব আর দিলীপ দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি রাত তুপুর পর্যন্ত পিসু নিধন নিয়ে ব্যস্ত। একবার ঘুম আসে, আবার ওদের অত্যাচারে ঘুম ভেঙ্গে যায়। এইভাবে একসময় রাত কেটে ভোর হল।



আজ ত্রিশ আগষ্ট। ঘুম থেকে উঠে সুদর্শন শৃঙ্গের দর্শন লাভ করলাম। ভোরের আলোয় যেন এক অন্য রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তৈরি হয়ে দোকানে এলাম। চা খেয়ে পুরী তরকারি গুছিয়ে নিলাম, সঙ্গে মাইসোরপাক গোছের একরকম মিষ্টি। জানলাম, কাল রাতে খবর পাওয়া গেছে, গোমুখে হারিয়ে যাওয়া পাভা সত্যনারায়ণ প্রসাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু সঙ্গের গোয়ালিয়রের যাত্রীটিকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। বরফের চাঁই চাপা পড়ে সত্যনারায়ণ পান্ডা মারা গেছেন। কানে খুব কম শুনতেন, বয়স বছর পঞ্চাশ-পঞ্চার মতো হবে। গোয়ালিয়রের ভদ্রলোকও সম্ভবতঃ মারাই গেছেন। গঙ্গার জলে ভেসে গিয়েই থাকুক বা কোথাও বরফ চাপা পড়েই থাকুক, তাঁকে খোঁজা হচ্ছে। দোকানদার সাবধান করে দিয়ে বলল, এখন বরফ গলার সময়, যেন গোমুখের খুব কাছে না যাই। শুনলাম, এখানকার সব পাভারা সত্য নারায়ণের শেষকত্য করতে গোমখ চলে গেছে। খবর ভনে পুলিশ স্টেশনে এলাম। ট্রাভেলার্স লজের পাশেই। কিন্তু অদ্ভূত ব্যাপার পুলিশ স্টেশনে তালা দেওয়া। শুনলাম সবাই গোমুখ চলে গেছে। ভেবে দেখলাম পুলিশের

জন্য অপেক্ষা করতে গেলে, একটা দিন অন্তত নষ্ট। গঙ্গোত্রী

ঝেঁটিয়ে সবাই যখন গোমুখ গেছে, তখন আমরা আর পড়ে থাকি কেন? আমরাও সেই একই পথে পা বাড়ালাম। বুকের মধ্যে যেন কেমন একটা ভয় দানা বেঁধে উঠছে, সেটা রাস্তার বিপদের ভয়, না পুলিশের ঝামেলার ভয়, বলতে পারব না। দোকানে দেখা হয়ে গেল ভাবরানী, গরমকুণ্ডে দেখা সেই সাধু গোছের ভদ্রলোকটির সঙ্গে, যিনি আমাদের অভিশপ্ত জীপেও সঙ্গী হয়েছিলেন। জানতে পারলাম তাঁর নাম রামজী। এখানে ভৈরবঘাঁটী থেকে লঙ্কা আসার জীপ ড্রাইভারকেও চা খেতে দেখলাম। জানা গেল, এপথে ওই একটাই জীপ যাতায়াত করে। আমরাও গতকাল ওতেই গঙ্গোত্রী এসেছিলাম। বললাম, আগামীকাল দুপুর নাগাদ এখান থেকে লঙ্কা ফিরব, যদি দয়া করে সেই সময় জীপটা গঙ্গোত্রী নিয়ে আসে, তাহলে খুব ভাল হয়। জানাল, লঙ্কা থেকে গঙ্গোত্রীর প্যাসেঞ্জার না পেলে সে গঙ্গোত্রী আসে না। তবু আমাদের অনুরোধে এখানে জীপ নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। এখান থেকে লঙ্কা যেতে, বা লঙ্কা থেকে ডাবরানী যেতে প্যাসেঞ্জারের অভাবে যাতে অসুবিধায় পড়তে না হয়, তাই রামজীকেও অনুরোধ করলাম আগামীকাল আমাদের সঙ্গে লঙ্কা ফিরতে। এবার এগোনোর জন্য উঠে পড়লাম। দোকানদার ও স্থানীয় কিছু পাভা আমাদের যাত্রার শুভ কামনা জানাল। আমরা ফিরে না আসার দেশ, গোমুখের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)





রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়া গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লিখতে ভালো লাগলেও এই প্রথম কোনও পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠানো। 'আমাদের ছুটি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, পাঠক, সমালোচক এখন নেমে পড়েছেন কীবোর্ডে-মাউসে সহযোগিতাতেও।

\$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন : গড় : 0.00 Like Be the first of your friends to like this.



আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন



= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেডানোর ছবি-লেথা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

অন্যস্বাদের উত্তরবাংলা

সৈকত গুপ্ত

পায়ের তলায় সর্ষে – এই প্রবাদটা বাঙালির ক্ষেত্রে বহুবার ব্যবহৃত। বেড়ানোর অদম্য ইচ্ছে আর নতুনকে জানার আনন্দে আমরা বেড়িয়ে পড়ি মাঝে মাঝেই। কখনও বা আগে খেকে টিকিট কেটে, প্ল্যান করে আবার কখনও বা একেবারে শেষ মুহূর্তে। এবারের বেড়ানোটা বেশ কিছুটা আকশ্মিক ভাবেই হল, প্রস্তাব এল আর সাত-পাঁচ না ভেবেই হাঁ-ও বলে দেওয়া হল। কথায় বলে বিধি বাম, তাই চার-পাঁচ দিন আগে খেকে শুরু হল প্রাকৃতিক তুর্যোগ। যে-সে নয়, একেবারে ভূমিকম্প – নেপালে মারা গেল অগুন্তি মানুষ আর তার প্রভাব এসে পড়ল সুদূর কলকাতাতেও। এপ্রিলের তুপুরে বেশ অনুভব করা গেল সেই কম্পন আর সঙ্গে পরবর্তী কটা দিনও। সংশয় নেমে এল আপাতত নিরাপদ সমতলে, আদৌ যাওয়া হবে তো? একে একে যোগ হতে থাকল নানা খবর, কিছু ভুল, কিছু গুজব। তবু একটা আশঙ্কা তো খেকেই যায়। নেপালে হাজার হাজার মানুষ সব হারিয়েছে, কিছু ক্ষয়্মকতি হয়েছে মিরিক আর পেলিং সংলগ্ন জায়গাতে আর আমাদের গন্তব্যও সেই দার্জিলিং জেলার কার্শিয়ং আর কালিম্পং। একটু যে চিন্তায় ছিলাম না, তা বলব না। কিন্তু মনে একটা বিশ্বাসও ছিল যে কিছু হবে না।

ঠিক ছিল যে চিরাচরিত জায়গাগুলোতে থাকব না। তাই, কার্শিয়ং-এ না থেকে মকাইবাড়ি চা বাগান আর কালিস্পং এর জায়গায় সিলারি গাঁও। একটু অন্যরকম জীবনের স্বাদ পেতে এই আয়োজন। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে গন্তব্য সোজা মকাইবাড়ি চা বাগান। সুকনা হয়ে গাড়ি চলছে রোহিণীর দিকে, তুপাশে যথারীতি সেই অবর্ণনীয় সৌন্দর্য যা ভাষায় প্রকাশ করা বেশ কঠিন। গভীর জঙ্গল আর তার পেছনে পাহাড়ের সারি কেন যে বারবার সবাইকে টেনে নিয়ে আসে, সেটা এখানে এলে বেশ বোঝা যায়। টয় ট্রেন এখন নতুন করে চলছে, তারও দেখা পাওয়া গেল অচিরেই। আপন মনে নিজের গতিতে সে ছুটে চলেছে রাস্তার একপাশ দিয়ে। নতুন রং করা কামরা আর সেই আগের মতন ইঞ্জিন যেন একটু বেশি গতি পেয়েছে এবারে। বিদেশি অতিথিরা আজও এই হেরিটেজ ট্রেন এর ওপর ভরসা করে কার্শিয়ং আর দার্জিলিং যায়। সময় হয়ত একটু বেশি নেয়, কিন্তু "এ স্বাদের ভাগ হবে না"। দেখতে দেখতেই পৌছে গেলাম রোহিণী, এখানে কিছু না খেলে আরও ওপরে উঠতে বেশ কষ্ট হবে। পাহাড়ে যাব অথচ মোমো খাবো না, সেটা তো হয় না, সঙ্গে বেশ গরম গরম এক কাপ চা। মনটা খুশিতে ভরে গেল। একবার মাথা উঁচু করে দেখে নিলাম কোন রাস্তা দিয়ে আমরা কার্শিয়ং হয়ে মকাইবাডি যাব। দেখেই বুঝলাম, বেশ উচ্চতা আছে। আনন্দ আরও বেডে গেল।

সুকনা ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে যখন আজ সকালে আসছিলাম তার যে দৃশ্য আর এখন রোহিণী হয়ে কার্শিয়ং-এর যে রাস্তা, তার নিসর্গ একটু আলাদা। পাহাড় অনেক কাছে এখানে, রঙ আর চরিত্র তুটিরই বদল হয়েছে। যোগ হয়েছে সবুজ চা বাগান যা মাঝে মাঝে উকি দিয়ে আবার হারিয়ে যাছে। যে কথা বলছিলাম, ফিরে আসি কার্শিয়ং-এর পথে। চলতে চলতে কখন যে ঢুকে পড়েছি শহরে, খেয়ালই নেই। টনক নড়ল ডানদিকে টয় ট্রেনের লোকো শেড আর বাঁদিকে কার্শিয়ং স্টেশনকে দেখে। নড়েচড়ে বসল সবাই, অনেকটা এসে গেছি, আর একটুখানি রাস্তা। স্টেশনকে বাঁ পাশে রেখে চললাম মকাইবাড়ির পথে। চোখে পড়ল আকাশবাণীর কার্শিয়ং স্টেশন। কলকাতাতে অনেকবার রেডিও অফিসে ঢোকার সৌভাগ্য হয়েছে, এখানে সে সুযোগ নেই। আরও একটা জিনিস চোখ এড়াল না, স্থানীয় নেপালিরা ছাড়াও অনেক খ্রীস্টধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে বসবাস করেন। রাস্তার পাশে বেশ কিছু অন্তিমশয্যা সেটাই জানান দেয়। মকাইবাড়ি চলে এলাম, এবার ঘর খোঁজার পালা।

মকাইবাড়িতে কোন হোটেল নেই। এখানকার কিছু মানুষ তাদের নিজেদের বাড়িতে অতিথিদের রাখেন। খেতেও দেন ভালোমন্দ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক নামীঅনামী হোটেলে রাত কাটিয়েছি, কিন্তু বেড়াতে এসে কারো বাড়িতে এভাবে থাকা
জীবনে প্রথম। সঙ্গে যারা ছিল তারা অনেকেই আগে এই সুখরস আস্বাদন করেছেন,
আমার মত কিছু মানুষের কাছে এটা বাড়তি পাওনা। চোদ্দ জন আছি আমরা, তাই
তিন-চারটি বাড়ি তো লাগবেই আর সেটা করতে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল।
স্থানীয় মানুষেরা খুব সুন্দর আয়োজন করে রেখেছেন অতিথিদের জন্য, না দেখলে
বিশ্বাসই হবে না। পরিপাটি করে সাজানো ঘর, স্নান-খাওয়ার জন্য উষ্ণ জল আর
ডাকলেই হাসিমুখ দর্শন – আর কি চাই বাঙ্গালির বেড়াতে এসে? পাহাড়ি বৃষ্টিও
ওয়েলকাম জানাল আমাদের এরই মাঝে।

পুপ্রের খাওয়া শেষ, একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মকাইবাড়িকে জানতে। এমনিতে খুব একটা বড় জায়গা নয়, তবে মকাইবাড়ি মানেই বিস্তৃত সবুজ চা বাগান। যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই পাহাড়ি ঢালে বেড়ে ওঠা চা গাছ। পাথুরে রাস্তা দিয়ে বেশ খানিকটা নেমে পৌছে গেলাম অনেকটা নীচে। স্থানীয় নেপালি মহিলারা চা তুলে পিঠে বাঁধা ঝুড়িতে ফেলতে ব্যস্ত। কী অদ্ভূত নিপুণতায় একে একে জমা হচ্ছে ছটি পাতা আর একটি কুঁড়ি। ভনলাম, এই চা বাগান বহু বছরের ঐতিহ্যশালী আর সবচেয়ে পুরনোও বটে। ১৮৫৯ সালে গিরিশ চন্দ্র ব্যানার্জি ৪৬০০ ফিট ওপরে কার্শিয়ং এর বুকে এই ১৫৭৫ একরের চা বাগান শুক করেন। স্বাদে আর গঙ্গে অতুলনীয় এই চা দেশে বিদেশে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অধিকার করে আছে। একে একে এই চা বাগানের হাল ধরেন তারাপদ ব্যানার্জি এবং পশুপতিনাথ ব্যানার্জি। কিন্তু, মকাইবাড়িটি এস্টেট আজ আর ব্যানার্জিদের একার নয়, অনেক টালবাহানার পর বর্তমান বংশধর স্বরাজ (রাজা) ব্যানার্জি এই চা বাগানের বেশিরভাগটাই (৯০%) লক্ষ্মী গ্রুপকে বিক্রিকরে দিয়েছেন, যদিও আমৃত্যু তিনি এখানকার ডিরেক্টর পদে আসীন থাকবেন। দেখা





হল তাঁর সঙ্গেও, রোজকারের অভ্যেস মত আজও এসেছিলেন নিজের হাতে সব তদারক করতে আর ফিরেও গেলেন রাজারই মত, ঘোডায় চড়ে।



মকাইবাডির মুকুটে একে একে যোগ হয়েছে অনেক পালক। ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিক আর ২০১৪-র ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপে এই চা ভারতকে বিশ্বের মানচিত্রে এক নতুন পরিচিতি এনে দিয়েছে। জাপান, ইংল্যান্ড, আমেরিকাতে এই চায়ের কদরই আলাদা। গতবছর, কেজি প্রতি ১,১১,০০০ টাকায় নিলাম হয়েছে মকাইবাড়ির চা যা এক সর্বকালীন ইতিহাস। আমাদের ভীর সাংভি, ফ্রান্সের লুসানে আর বিবিসি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছে মকাইবাডিকে নিয়ে, টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদেও এসেছে মকাইবাড়ি চা বাগান। অন্যান্য বাগানে শুধুই চা গাছ থাকে, কিন্তু মকাইবাড়ি চা বাগান প্রাকৃতিক জঙ্গল আর চা গাছের এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ। একটা জিনিস দেখে আর জেনে খুব ভাল লাগলো, ২০০৭ সালে তৈরি হওয়া মকাইবাডি কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার। স্থানীয় নেপালি

মানুষদের কর্মসংস্থানের জন্য তৈরি হওয়া এই সেন্টারে ছেলেমেয়েরা কম্পিউটার শেখে, মহিলারা শেখেন চায়ের বাক্স বানানো আর প্রিন্টিং এর কাজ। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সবরকম সহযোগিতা করে এই কমিউনিটি সেন্টার। চা বাগান তো দেখা হল, কী করে চা পাতা তুলতে হয় তার ট্রেনিংও পাওয়া গেল কিন্তু এই চা পাতা কী ভাবে আমাদের রোজকার জীবনে সকালবেলা কাপে করে আসে সেটা জানতে গেলে যেতে হবে পাশের ফ্যাকট্রিত। মকাইবাড়ি টি ফ্যাকট্রি। আমরা বাইরের লোক তাই মাথা, পা, মুখ সব ঢেকে ঢুকলাম এক নতুন স্বর্গরাজ্যে। দোতলা এই ফ্যাকট্রি শুধু "চা" ময়। এক অপূর্ব গন্ধের মাদকতা সঙ্গে যন্ত্রের অবিরাম চলন, তুটো মিলে মিশে এক অদ্ভূত অনুভূতি। বাগান থেকে তুলে আনা চা পাতা একের পর এক মেশিনে চলে যাছে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রসেসিং এর জন্য। কমীরা নিখুতভাবে একই কাজ করে চলেছেন বছরের পর বছর। শেষ ধাপে পাওয়া গেল সেই চা যা বাক্সবন্দী হয়ে পৌছে যায় আমাদের সবার বাড়িতে। ফ্যাকট্রির গেটের ঠিক পাশেই আছে চা কেনার দোকান। যাদের ইচ্ছে কিনে নিতে পারেন বিভিন্ন মানের চা, তবে হাাঁ, মকাইবাডির চা কিন্তু বেশ দামি।

ভোরবেলা সূর্যোদয় দেখা যেকোনো পাহাড়ি জায়গায় এক সন্দর অভিজ্ঞতা, মকাইবাডিও তার ব্যতিক্রম নয়। সকালে দীর্ঘ প্রতীক্ষা, পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে কখন দেখা যাবে টকটকে লাল থালা। দেখাও গেল, ছবিও উঠল দেদার। ভোরের নরম আলো গায়ে মেখে বসে থাকতে কার না ভাল লাগে. কিন্তু এই সকালটাই এবারের মতো মকাইবাডিতে আমাদের শেষ সকাল। পরের গন্তব্য কালিম্পং। তার আগে একটু হেঁটে নীচের দিকে নেমে শনি মাতার মন্দির আর আরও নীচে বালুসান নদী, সঙ্গে মিরিক শহরের আভাসও পাওয়া গেল। ফিরে আসা যে যার ঘরে, একটু পরেই গাড়ি আসবে। সারাদিনের প্ল্যান, কালিম্পং হয়ে সিলারি গাঁও পৌঁছাতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ছেড়ে চলে যেতে হবে এই হোম স্টেগুলো, যাদের মালিকরা এই তুদিন আমাদের সব আবদার মেনে নিয়েছেন। বাঙালি অতিথি দেখে চিকেনের থেকে মাছ বেশি খাইয়েছেন, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন



রাতে আমাদের খাওয়া শেষ হওয়া অব্দি আর হাসিমুখে সম্মানের সঙ্গে "খাদা" দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন আমাদের। এ এক বিরল অভিজ্ঞতা, মন ছুঁয়ে যাওয়া কিছু মুহূর্ত যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কিংবা কী ভাবে তুলে ধরব ছোট ছোট পাহাড়ি ছেলেমেয়েগুলোর অনাবিল হাসি যখন তারা সবাই নতুন জামা কাপড় পেল? একটা স্বেছাসেবী সংগঠন পাহাড়ি ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে এসেছিল অনেক খেলনা, বই, খাতা, পেন আর জামাকাপড়। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ছোট ছোট শিশুদের উৎসুক চোখ জানান দিচ্ছিল এক নির্মল আনন্দ, কেমন করে আমরাও যেন ফিরে পেলাম সেই সোনালী অতীতের দিনগুলো। এই অনুভূতি ভাষা পায় না, শুধু মনের মণিকোঠায় কোহিনুরের মতো জুলজুল করে।

মকাইবাড়ি থেকে যাত্রা শুক্ত করলাম কালিস্পং এর উদ্দেশ্যে। কার্শিয়ং বাজার ছাড়িয়ে গাড়ি চলল পাহাড়ি পথে। আজ বিশেষ দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা, তাই রাস্তার ধার দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ চলেছেন নিকটবর্তী শুস্ফাতে। তুপাশে অবর্ণনীয় কিছু সৌন্দর্য, কোথাও অনেক গভীরে ক্ষুদ্র জনপদ আবার কোথাও সাদা মেঘের নরম আস্তরণ। পাহাড়ের এই এক মজা, টুকরো টুকরো মেঘ এসে কখন যে ভিজিয়ে দিয়ে যাবে, টেরও পাওয়া যায় না। কুয়াশার মতো মেঘ ভেদ করে গাড়ি চলেছে। সোনাদা পেরিয়ে ঘুমকে পাশে রেখে আমাদের গাড়ি কালিস্পং-এর রাস্তায়। তুপুরের খাবার আজ রাস্তায় খেতে হবে, তাই লেপচু বাজারে ডাল, ভাত আর মাংস খেয়ে নিলাম। আবার পথ চলা।

প্রথম যেখানে গিয়ে থামলাম, দেখি বড় করে গেটের ওপরে লেখা আছে Eagle's Crag। এটাই কার্শিয়ং এর উচ্চতম স্থান, এখান থেকে খুব সুন্দর দেখা যায় তিস্তা নদী আর বিস্তীর্ণ উপত্যকা। কথিত আছে, আকাশপথে বিমান যাওয়া আসার সময় পাখির সঙ্গে অনেক সময় ধাক্কা লাগত বলে এখানে স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশরা কিছু ঈগল পাখি রেখেছিল যাদের কাজ ছিল বাকি সব পাখিদের মেরে বিমানের রাস্তা পরিস্কার রাখা। এর সমর্থনে কোন যুক্তি খুঁজে না পেলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের এমনই ধারনা। যদিও অনেকে বলেন ঈগল পাখি অনেক উঁচু থেকে সবকিছু দেখতে পায় আর এই স্থানটিও কার্শিয়ং এর সবচেয়ে উঁচু স্থান, তাই এর নাম Eagle's Crag। একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখলাম, এই নামে ইংল্যান্ডে একটি দর্শনীয় পাহাড়ের সারি আছে, তার থেকেও এর নামকরণ করা হলে অবাক হব না। যাই হোক, এখানেই আছে কার্শিয়ং-এর সবচেয়ে বড় জলাধার, কারণ সহজেই অনুমেয়, উচ্চতা। খুব সুন্দর করে সাজানো এই বাগানের একদিকে আছে গোর্খাদের স্মৃতিসৌধ। শান্ত একটা জায়গা, ওয়াচ টাওয়ার থেকে অনেক দূর অন্ধি দেখা যায় যদি না মেঘ বা কুয়াশা থাকে। কিছুক্ষণ এখানে কাটিয়ে আমরা চললাম পরের গন্তব্যের দিকে।



জায়ণাটার নাম গিদ্দাপাহাড়, যেখান থেকে কার্শিয়ং আর তার আশেপাশের অনেকটা জায়ণা খুব ভালোভাবে দেখা যায়। একটা ভিউ পয়েন্ট বানানো আছে, সেখান থেকে পাহাড়ি রাস্তা আর নীচের চা বাগানের ছবি সত্যিই মনোরম। এই গিদ্দাপাহাড়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের বাড়ি। আসলে ১৯২২ সালে শরৎচন্দ্র বোস এই বাড়িটি কেনেএক ব্রিটিশ সাহেব রাউলিং লেসিলেস ওয়ার্ড-এর থেকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পদধূলি পাওয়া এই বাড়ি শরৎচন্দ্র এবং সুভাষের খুব প্রিয় ছিল। টানা দুবছর শরৎ বোস এই বাড়িতে বিটিশদের দ্বারা অন্তরীণ ছিলেন। সুভাষও এই বাডিতে বন্দীদশা কাটিয়েছেন দীর্ঘ ছমাস। এই

ছামাসে তিনি লিখেছিলেন অন্তত ছাব্দিশটা চিঠি যার মধ্যে এগারটা ছিল স্ত্রী এমিলি শেঙ্কেল-কে লেখা। এমিলিও নেতাজিকে দশটি চিঠি লিখেছিলেন, এই বাড়ি সেই সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে। এই বাড়িতে বসেই নেতাজি লেখেন সেই বিখ্যাত ভাষণ যা তিনি হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হয়ে পাঠ করেছিলেন। Netaji Institute of Asian Studies এখানে গড়ে তুলেছে এক অনন্য সংগ্রহশালা। নেতাজি, এমিলি আর কন্যা অনিতার অনেক ছবি, অসংখ্য চিঠি, ব্যবহৃত আসবাব আজও একইভাবে রাখা আছে। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের এক আঁতুড়ঘর এই বাড়ি। ছেড়ে আসতে মন চায় না, বারবার ছুঁতে চায় সেই মানুষটাকে যিনি নিজের সর্বস্ব দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে এক নতুন অধ্যায়ের সচনা করেছিলেন।

পরবর্তী গন্তব্যস্থল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ভূতুড়ে স্থান, ডাও হিলস। লোকমুখে শোনা, গা ছমছমে এই ঘন পাইনের অরণ্যে প্রায়শই দেখা যায় এক মুওহীন বালককে, আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হাড়িয়ে যায় গভীর জঙ্গলে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে খুঁজে দেখবেন। অনেকেই নাকি দেখেছে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া তুজনের ঠিক পাশে পাশে তৃতীয়জনকে যে আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে আপন খেয়ালে। বিশাল গভীর এক খাদ আছে, সেখান থেকে উঠে আসা মানুষের গোঙানি অনেককেই ভয় পাইয়ে দেয়। নানান মানুষকে খুন করে নাকি ওই খাদে ফেলে দেওয়া হয়েছে অতীতে। স্থানীয় কাঠুরেরা আজও সন্ধ্যের পর কেউ ডাও হিলস-এ থাকে না, তাদের ধারণা পাশের স্কুলে ভূত থাকে। লাগোয়া চার্চ আর মিউজিয়াম স্থাপত্যশৈলীর এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তবে বলে রাখা ভাল, বহুদ্র গিয়েও আমরা ভূতের দেখা পাইনি, বরং দেখেছি হরিণের আঁতুডঘর। অনেক ছোট ছোট হরিণ একটা ঘেরা জায়গাতে সঙ্গে তাদের মা। ডাও হিলসে এটাই বোধহয় সবচেয়ে ভাল পাওনা।

কালিস্পং যাওয়ার পথে এবার পড়ল ডেলো পাহাড়। মনোরম পরিবেশ, সুন্দর করে সাজানো একটা রিসর্ট আর অনেকখানি ছড়ানো সবুজ। বেশ কিছুটা উঁচু থেকে খুব ভাল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায় যদি আকাশ পরিস্কার থাকে। তিস্তা নদী বয়ে চলেছে আপন বেগে। চাইলে কেউ এখানে প্যারাগ্লাইডিং করে আকাশে উড়ে থাকতে পারে অনেকক্ষণ। বিকেল অতিক্রম করে গেছে, না দাঁড়িয়ে চলতে থাকলাম। এবার তো আমরা কালিস্পং-এ থাকব না, যাব কালিস্পং থেকেও বেশ খানিকটা ওপরে সিলারি গাঁও। সিলারি গাঁওতে ঢোকার মুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো এক অসমান পাথুরে রাস্তা। বন দপ্তর রাস্তা করেনি চোরাশিকারীরা গাছ কেটে নিয়ে চলে যাবে বলে, তাই একের পর এক পাথরে সাজানো রাস্তা। চলতি ভাষায় এর নাম Dancing Road। এক ঘণ্টার এই বন্ধুর পথ আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে, যদিও সব শারীরিক কষ্ট লাঘব হয়ে গেল সিলারি গাঁওতে পৌছে। প্রকৃতি যে এমন বরণডালা নিয়ে অপেক্ষা করছিল. সেটা সন্তবত কেউই জানতাম না।

আগেই বলেছি, আজ পূর্ণিমা। তাই সিলারি গাঁও থেকে চাঁদকে একটু স্পেশাল তো লাগবেই। এখানে পা দিতেই যেটা খুব ভাল লাগলো, তা হল এক অদ্ভুত নীরবতা। আমাদের কয়েকজনের কথাবার্তার আওয়াজ ছাড়া সত্যিই বড় শান্ত একটা জায়গা। দূরে পাহাড়ের সারি, জ্যোৎস্না মাখা সন্ধ্যায় গান হল একে একে – "আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে", "জাগরণে যায় বিভাবরী" ইত্যাদি। পরিবেশটা এক লহমায় অনেকটা পালটে গোল। চায়ের কাপ হাতে সবার দৃষ্টি তখন চারদিকের প্রতিটি কোণায়, একটা কোন মুহূর্তও যেন চোখের পলক ফেলার আগে মিলিয়ে না যায়। কখন যে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়ে গোল, কেউ বুঝতেই পারলাম না। এমনিতেই পাহাড়ি মানুষরা তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, এখানে যার আতিখ্যে আছি তিনিও ব্যতিক্রম নন। তবু অপেক্ষা করলেন শহুরে এই মানুষগুলোর জন্য। বেশ ভালো থাকার জায়গা, সাকুল্যে ছটি ঘর, কিন্তু বেশ সুন্দর আর ছিমছাম। আয়োজনের বাহুল্য নেই, ঠিক যেটুকু লাগতে পারে তাই আছে। সামনে কাঞ্চনজঙ্খার সারি এই অঞ্চলের মূল আকর্ষণ। এর টানেই এতটা পথ কট্ট করে আসা।

সকালে উঠে মন খারাপের পালা। পাহাড়ি সূর্য ধীরে ধীরে উঠে জানিয়ে দিল আজ শেষ দিন। একটু পরে গাড়ি আসবে, এই মায়াময় সৌন্দর্য ছেড়ে ফিরতে হবে বাস্তবের সমতলে। তার আগে ঠিক হল, ঘুরে আসা হবে এই সিলারি গাঁও এর সবচেয়ে উঁচু জায়গা, রামিতে ভিউ পয়েন্ট। গাড়ি যাবে না, পায়ে হেঁটে এক ঘণ্টায় পোঁছান গোল। তুপাশে জঙ্গল আর তার মাঝে সরু একটা পায়ে হাঁটা রাস্তা। জোঁকের আধিক্য বেশ, কয়েকজন তাদের শিকারও হল। সদ্য বৃষ্টি হওয়া সেই রাস্তা সাবধানে পেরিয়ে অবশেষে এলাম মূল জায়গায়। এতটাই উঁচু যে চারপাশের সব কিছু প্রায় ৩৬০ ডিগ্রি প্যানোরামায় দেখা দিছে। উঁচু পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ালে কোন শৃঙ্গজয়ের অনুভৃতি হছে। ঠাণ্ডা একটা পরিবেশ, তিস্তা নদীর অসংখ্য বাঁক এক অন্য রূপ দিয়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ফিরে আসতে মন চায় না। তাও আসতে হল ফিরে। ব্যাগ গুছিয়ে এবার গাড়িতে ওঠার পালা। ও ভালো কথা, একটা জিনিস তো বলাই হয়ি। সকালের এই পুরো সিলারি গাঁও থেকে রামিতে হয়ে আবার ফিরে আসার জন্যে আমরা গাইড পেয়েছিলাম। একজন নয়, পাঁচ পাঁচজন। আমাদের সাথে তারা শুরু যায়ই নি, রাস্তা চেনানোর ফাঁকে ফাঁকে নিজেরাও খুব আনন্দ করেছে। খেয়াল রেখেছে আমরা পিছিয়ে পড়লাম কিনা, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে যদি কেউ পিছিয়ে পরে তার জন্য। এই সারমেয়কুল যেভাবে আমাদের নিয়ে গোল আর ফিরিয়ে আনল, সত্যিই এক কথায় তা অভাবনীয়। প্রভুভক্তের নিদর্শন তারা অনেকই রাখে, কিন্তু বিদেশ বিভূঁইতে কিছু অচেনা মানুষের জন্য তাদের এই স্বার্থত্যাগ সত্যিই কৃতিত্বের দাবি রাখে। আর হয়তো কোনোদিনই দেখা হবে না ওই পাঁচজনের সাথে, কিন্তু যতদিন কোথাও বেড়াতে যাব, বেশ কিছুটা রাস্তা যখন পায়ে হাঁটব, মনে পড়বে এই পাঁচ সঙ্গীর কথা।



পেশায় কনটেন্ট ডেভেলাপার সৈকত গুপ্ত ভালোবাসেন বেড়াতে।



কেমন লাগল : - select -

মত দি<u>য়ে</u>ছেন : গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.



<u>আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন</u>

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com © 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

= 'আমা

সান্দাকফ্-র পথে চলে যেতে যেতে

পল্লব চক্ৰবৰ্তী

~ সান্দাকফুর তথ্য~ সান্দাকফু ট্রেকরুট ম্যাপ~সান্দাকফুর আরও ছবি ~

অনেক দিন একসঙ্গে কোথাও যাওয়া হয় নি।

অবশেষে মোটে তুজন যেতে রাজি হল। মার্চের শেষের দিকে তুগ্গা তুগ্গা বলে তিন জন কিছুটা ভার, কিছুটা আনন্দ, আর কিছুটা রোমাঞ্চ মেশানো অনুভূতি নিয়ে চেপে বসলাম কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে। বহুদিনের ইচ্ছে ছিল কোনও ট্রেকিং-এ পাড়ি দেওয়ার। ঠিক করেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম স্থান সান্দাকফুতেই হোক আমাদের হাতেখড়ি। শিলিগুড়ি থেকে শেয়ার জিপে ঘুম, ঘুম থেকে সুখিয়াপোখরি হয়ে একপেট খিদে নিয়ে কুয়াশা মাখা অষ্পষ্ট ত্বপুরে হাজির হলাম মানেভঞ্জন। উঠলাম পূর্বশ্রুত জীবন ছেত্রির হোটেলে। জীবন দাজুর আন্তরিক ব্যবহার আর ঝকঝকে বাংলা ভাষা মনে দাগ কেটে গেল। ডাল, ফুলকপির তরকারি আর ডিমের ঝোল দিয়ে অসাধারণ লাঞ্চ সেরে গেলাম আমাদের গাইড ঠিক করতে আর অন্যান্য প্রস্তুতি সেরে ফেলতে। হাসি হাসি মুখের প্রায় বাচ্চা ছেলে রবিন ছেত্রিকে দেখে প্রথম দর্শনেই ভালো লাগল। এই ভেবে ভরসা পেলাম যাত্রাপথে একজন কথাবলার সঙ্গী পাওয়া যাবে. একে আমাদের খুব ছোট দল তার ওপর বন্ধু রাজীব খুব চুপচাপ।

পরদিন সকাল সকাল চা খেয়ে যাত্রা শুরু প্রথম দিনের গন্তব্য তুমলিং –এর উদ্দেশ্যে। শুরুতেই বেশ খাড়া রাস্তা। মনটা দমে গেল, মনে হল পারব তো? প্রিয়জনদের আপত্তি সত্ত্বেও ঢাক ঢোল পিটিয়ে বেরিয়েছি, শেষে কি লজ্জার মাথা খেয়ে ল্যান্ডরোভার চেপেই যেতে হবে সান্দাকফু? যাই হোক এক সময় হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে পোঁছাই এই রাস্তার প্রথম জনপদ চিত্রে। সামান্য ব্রেকফাস্ট আর বিশ্রামের পর ফের হাঁটা শুরু। এবার রাস্তা আর অত চড়াই নয়। কখনও সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর দিয়ে কখনো ম্যাগনোলিয়া গাছের ছায়ায় ঢাকা বনবীথি ধরে এগিয়ে চলি। অচিরে এসে গেল ছায়্ট গ্রাম লামেধুরা। ক্ষণিকের বিশ্রাম শেষে ক্লান্ত পদযুগল নিয়ে আবার যাত্রা শুরু। এবার যেন রাস্তা আর ফুরোতে চায় না। পথে আলাপ হল অনেক ট্রেকিং দলের সঙ্গে। ভালো লাগল সল্টলেকের এক ভদ্রলোকের দেখা পেয়ে। তিনি যৌবনে এইচএমআই থেকে কোর্স করেছিলেন আর এখন দুই কন্যা আর স্ত্রীকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছেন। কথায় কথায় সময় কখন কেটে গেল। রবিনের কাছে নেপালি শিখতে শিখতে এসে পড়লাম নেপাল সীমান্তের ছায়্ট গ্রাম মেঘমা।

মেঘমা! - কে রেখেছিল অমন মিষ্টি নাম? এখানে ভীড় করে এল যতো রাজ্যের মেঘ, তুহাত দূরের মানুষকেও চেনা দায়। মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এগিয়ে চললাম আমরা চারমূর্তি আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে - পথ চলা...ক্রমশ চলা...। এভাবেই ক্লান্তি আর ভালো লাগা মিলে মিশে একাকার। আর যখন পারছিনা...যখন পিঠের বোঝা জগদ্দল পাথরের মত জাঁকিয়ে বসছে তখনই মেঘের আড়ালে কিছু বাড়িঘর দেখা গোল। রবিন জানান দিল, ওটাই তুমলিং। পরিস্কার আবহাওয়া থাকলে নাকি এখান থেকে কাঞ্চনজ্ঞা খুব ভালো দেখা যায়। প্রথম দিনের প্রায় পনেরো কিলোমিটার পথ হেঁটে ফেলেছি। আজকের মতো যাত্রা শেষে এখানেই রাতের আশ্রয়। লজে প্রবল ঠাণ্ডায় রাতের খাণ্ডয়া সেরে আমরা যখন নরম লেপের আদরে তখন ঘড়ি বলছে কলকাতায় এখন সন্ধের চা খাণ্ডয়ার সময়ও হয় নি।

পরদিন নুডুলস আর চা দিয়ে কোনোরকমে ব্রেকফাস্ট সেরে আবার যাত্রা শুরু। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছাই সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশ দ্বারে। নাম এন্ট্রি করে টাকা পয়সা জমা দিয়ে আবার এগোনো। এবার রাস্তা নীচের দিকে নামতে থাকে। ক্রমশ চোখে পরে রাস্তার ধারে ফুলের ভারে নুয়ে পড়া রডোডেনড্রন গাছের সারি...আলো হয়ে যায় চারদিক...বসন্ত এসে গেছে।

মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফুর দূরত্ব ৩১ কিমি। সিংগালিলা অভয়ারণ্যের মধ্যে দিয়ে পথ। পারমিট করে নিয়ে যাত্রা শুরু। পাইন ঘেরা চড়াই পথ ধরে চলতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে বিশ্রাম, তার সঙ্গে সুন্দর কিছু দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করা। দেড ঘণ্টা পর পৌঁছালাম ৪ কিমি দূরে চিত্রে গ্রাম। চিত্রেতে জলখাবারের বিরতি। ম্যাগি, চা আর সঙ্গে আনা কেক সহযোগে জলখাবার ভালই হল। আবার যাত্রা শুরু। এখান থেকে চডাই কিছু কম। কখনও ছোট গাছ আবার কখনও জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। অনেক ওষধি গাছ বা গুলা এই পথে পাওয়া যায়। গাইড অনেক রকম গাছ আর গুলা দেখাতে দেখাতে নিয়ে চললেন। বেলা ১১ টা নাগাদ এলাম মাত্র ৩-৪ ঘর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের বসতি লামেধুরা গ্রামে। আকাশ তখন মেঘে ঢেকে গেছে। একটু বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে চললাম। দিদি ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে, মাঝে আমি আর বোন আর দুই জামাই একেবারে পিছনে। বেলা ১ টা নাগাদ পৌঁছলাম মেঘমাতে। মেঘে ঢাকা মেঘমা, এক হাত দূরের জিনিসও দেখা দুষ্কর। সেনাবাহিনীর শিবিরে সবার নাম নথিভুক্ত করিয়ে প্রবল শীতের মধ্যে চন্দ্র স্যারের দোকানে গিয়ে



বসলাম। তু গ্লাস করে গরম জল খেয়ে মনে হল দেহে যেন সাড় এল। চা খেয়ে বসে রইলাম কিন্তু বাকিদের পাতা নেই। বেলা ৩ টে নাগাদ আমি আর দিদি আবার চলা শুরু করলাম। গাইডকে বাকিদের জন্য অপেক্ষা করতে বলে এলাম। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। সেই মানেভঞ্জন থেকেই আমাদের সাথী একটা করে কুকুর। প্রথমটি চিত্রেতে এসে চলে যায়। চিত্রে থেকে অন্য একটা কুকুর আমাদের সঙ্গী হয়। মেঘমা থেকে সেও আমাদের গাইড। ঘন মেঘে ঢাকা পথ ধরে কুকুরটির পাশে পাশে ১৫-২০ মিনিট হাঁটার পর হঠাৎ মেঘ কেটে গেল, দেখি সামনে সুন্দরী টুমলিং। প্রথমেই পড়ল শিখর লজ, আমাদের দ্বিতীয় দিনের আস্তানা। খুব পরিষ্কার করে সাজানো। লজ থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি মেঘের আড়াল থেকে উকি দিছে কাঞ্চনজঙ্খা! অসাধারণ সেই দৃশ্য।



ত্মচোখ ভরে দেখতে দেখতে এগোতে থাকি। এসে পড়ে জৌবাড়ি, তারপর গৈরিবাস। গরম মোমো খেয়ে একটু বিশ্রাম এবং আবার পথে নামা। প্রথম ত্র'কিলোমিটার বেশ চড়াই, তারপর মোটামুটি আরামদায়ক রাস্তা। আমি আর রাজীব এক সঙ্গে এগোতে থাকি। নাম না জানা পাখি আর ফুলের ছবি তুলতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ে বন্ধু অর্জুন আর রবিন। পথে পড়ে ছোট্ট লোকালয় কাইয়াকাট্টা। নির্জন পাহাড়ে কয়েকটা মোটে বাড়ি আর একটা চায়ের দোকান দেখে অবাক হয়ে ভাবতে থাকি এখানকার লোকজনের কী ভাবে সংসার চলে ? কী ভাবেই বা কাটে সময়? আমি আর রাজীব এগোতে থাকি, ক্রমশ পড়ে আসে বেলা, দীর্ঘতর হয় পাইন আর রডোডেনড্রন গাছের ছায়া। এভাবেই দেখা হয় নির্জন রাস্তার ধারে অলস হয়ে পড়ে থাকা কালো রঙের জল ভরা এক পুকুরের সঙ্গে। বুঝি এসে গেছি কালিপোখরি। ওদিকে ঘনিয়ে আসে এক আকাশ কালো মেঘ। একটু এগিয়ে হোটেলে পৌঁছে স্যাক ফেলে ধপ করে বসে পড়ি। চা আর সামান্য

খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি অর্জুন আর গাইড রবিনের জন্য। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করেও ওদের দেখা নেই। এদিকে বৃষ্টি প্রায় পড়ে পড়ে। ওদেরকে খুঁজতে বেরোবো কিনা ভাবছি, এমন সময় দেখা গেল বেশ খোশ মেজাজেই আসছে অর্জুন আর রবিন। ওরা এসে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে নেমে এল আকাশ ভাঙা তুমুল বৃষ্টি।

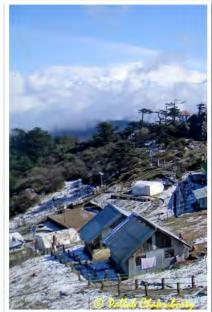
দার্জিলিং-এ কিছুদিন থাকার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে দিন খুব বৃষ্টি হয়, তার পরদিন ঝকঝকে পরিস্কার আকাশে কাঞ্চনজ্ঞা তার অপার্থিব রূপ নিয়ে হাজির হয়। তার ওপর রবিন আশার বাণী শোনালো -"কাল বরফ ভি মিল সাকতা হ্যায়"। আমরা নড়ে চড়ে বসি, কালই আমরা সান্দাকফু উঠব...দেখা যাক কপালে কী আছে। কনকনে ঠাণ্ডায় গরম গরম ভাত, ডাল, বীনের তরকারি আর ডিমের ডালনা দিয়ে অমৃতসম ডিনার খেয়ে সকাল সকাল লেপের মধ্যে ঢুকলাম। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত মাথার ভিতর রুমঝুম বাজতে লাগল... সান্দাকফু... কাঞ্চনজ্ঞা... বরফ...। হোটেলের টিনের চালে তখনও একটানা বেজে চলেছে বৃষ্টির সেতার। পরদিন সকাল। সময়, মঞ্চশয্যা, প্রেক্ষাপট – সবই

পরাদন সকালা সময়, মঞ্চনিয়া, প্রেক্ষাপাট – সবহ
পূর্বদিনের মতো। আমরা আবার হাঁটছি। কেবল উৎসাহ
আগের তুদিনের থেকে অনেক বেশি। সকাল থেকেই
সোনা রোদে ভেসে গেছে চারপাশ। আকাশে এক টুকরো
মেঘও কোথাও নেই। ইতিমধ্যে রবিন কী ভাবে জানতে
পেরেছে সান্দাকফুতে সত্যি স্বত্য তুষারপাত হয়েছে আর
প্রায় সপ্তাহ খানিক পর কাঞ্চনজজ্ঞা সহ পুরো ১৮০ ডিগ্রি



ভিউ পাওয়া যাছে। কাজেই আনন্দে আমরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলছি। খুব দ্রুত এসে গেল বিকেভঞ্জন। চা খেয়ে ফের পথে। এবার রাস্তা বেশ খাড়াই। তবু আমরা যতটা সন্তব দ্রুত এগিয়ে চললাম। সান্দাকফুর এক কিলোমিটার আগে প্রথম বার দেখলাম রাস্তার ধারে বরফ। তার পরেই চোখে পড়ল মাউন্ট পান্তিম... ক্রমশ অন্যান্য চূড়া।

মনে হল জীবন বড় সুন্দর...বেঁচে থাকা বড় ভালো...।



বরফ বিছানো সকাল - সান্দাকফ

পৌছে গোলাম সান্দাকফু, পূরণ হল বহুদিনের সাধ। গতকাল রাত্রের পড়া বরফ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, বাড়ি আর হোটেলের টিনের চাল সব সাদা। আমরা পি ডবলু ডি -র বাংলোতে গিয়ে উঠলাম। পিঠের স্যাক রেখেই ছুটলাম ছবি তুলতে। উত্তর দিগন্তে তখন ছুটানের তুষার শৃঙ্গ থেকে শুরু করে পশ্চিমে একেবারে লোৎসে, এভারেক্ট ছাড়িয়ে আর কিছু পিক দেখা যাছে। শরীরের সব ক্লান্তি নিমেষে উধাও। ভাবতে অবাক লাগল যে পৃথিবীর সব থেকে উঁচু পাঁচটি পিক-এর চারটিই আমার চোখের সামনে।

বাংলোতে ফিরে গিয়ে গরম গরম নুডলস খেয়ে তিন বন্ধু নানান গল্পে মেতে উঠলাম। সান্দাকফুর পি ডবলু ডি বাংলোটি এককখায় অসাধারণ। আজ আমরা সবাই খুব খুশি। বিকেলের দিকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল, ঘরের বাইরে বার হওয়া দায়। যত বেলা পড়ে আসছে তত ঠাণ্ডা বাড়ছে আর আমার মনও খারাপ লাগছে...কাল –ই আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব। রাতে ঠাণ্ডায় ভালো করে ঘুম এল না। ভোররাতে সবার আগে চলে গোলাম ভিউ পয়েন্ট। কনকনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া বইছে। হাত পা সব অবশ। ঝোড়ো হাওয়াতে ঠিক করে দাঁড়াতে পারছিনা। তবু সব কিছু ভুলিয়ে দিল অসাধারণ এক সূর্যোদয়।

এবার ফেরার পালা। বারবার মনে পড়তে লাগল রবি ঠাকুরের গান-"যখন ভাঙল মিলন মেলা..."। সান্দাকফুকে বিদায় জানিয়ে আমরা নামতে লাগলাম শ্রীখোলার পথে। মনে একটাই আফশোস রয়ে গেল - এ যাত্রায় আর ফালুট যাওয়া হল না। হয়তো সে জন্য আবার ফিরে আসব এ পথে। শ্রীখোলার রাস্তা প্রথম ছয়-সাত কিলোমিটার বেশ আরামদায়ক। রডোডেনড্রন, বাঁশ আর নাম নাজানা সব গাছের ছায়ায় ঢাকা হালকা উতরাই। কোথাও কোথাও বেশ ঘন জঙ্গল। কিন্তু তারপর শুরু ভয়ঙ্কর উতরাই। খুব দ্রুত নীচে নামছে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। বহু নীচে দেখতে পাছিছ গুরত্বম...দেখেই ভয়

লাগছে। হাঁটু আর গোড়ালির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। এর থেকে দেখছি ওপরে ওঠা ঢের সহজ। পথে অন্যান্য যে সব ট্রেকিং দলের সঙ্গে দেখা হল তারা সবাই আজ গুরত্বম থাকবে। আমরাই বোধহয় একমাত্র আরও ছয় কিলোমিটার পথ ঠেঙিয়ে শ্রীখোলা যাব। এদিকে আমার হাঁটু বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিয়েছে। যাইহোক এ ভাবেই এসে পড়লাম গুরত্বম। তৃপ্তি করে ডাল ভাত সবজি খেয়ে আবার রাস্তায়। পথ আর ফুরোতে চায় না। দেখা হল এক উদাসী পাহাড়ি নদীর সাথে। শ্রী তার নাম, মিষ্টি তার বয়ে যাওয়ার আওয়াজ। এরপর থেকে কখনও শ্রী খোলার পাশে পাশে কখনও বা একটু দূর দিয়ে আমরা

চললাম। ক্রমে এসে পড়ল নদীর ধারে অসাধারণ জায়গায় রিভার ভিউ লজ। তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে , সন্ধেও নেমে এসেছে। এখানেই আমাদের যাত্রা শেষ। কাল শেয়ার জিপ ধরে শিলিগুড়ি তারপর এনজেপি থেকে ট্রেন আর তারপর সেই গতানুগতিক জীবন। কিন্তু একদিকে নদীর গর্জন অন্যদিকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, আর লজে কেবল আমরা তিন বন্ধু আর রবিন...সব মিলিয়ে শ্রীখোলাতে কাটানো একরাত সারা জীবন মনে থেকে যাবে।





~ <u>সান্দাকফুর তথ্য ~ সান্দাকফু ট্রেকরুট ম্যাপ ~ সান্দাকফুর আরও ছবি</u> ~



পদার্থবিজ্ঞানের স্নাতক পল্লব চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য কর দফতরের আধিকারিক। ভালোবাসেন নানা ধরণের বই পড়তে। নেশা ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে পরিবারের কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কাছে বা দূরের ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়া। বেশি পছন্দের পাহাড় আর বন। এক সময় দার্জিলিং-এ চাকরি করেছেন বেশ কিছুদিন। সেই থেকে পাহাড়ের সঙ্গে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়া।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend 🚮 🖢 🖂 ...

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন



পায়ে পায়ে মরুর দেশে

সুদীপ্ত দত্ত

~ ডেজার্ট ট্রেকের আরও ছবি ~

বাঙালি স্বভাবে ভ্রমণপ্রিয়। কটা দিন ছুটি পেলেই পাহাড় আর সমুদ্রের ডাক অগ্রাহ্য করা যেন ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ে। তবে এবারের শীতের ছুটিটা বরাদ্দ রেখেছিলাম উষর মরুভূমির জন্য। ভারতের এক কোণে পরে থাকা থর মরুভূমি বেড়ানোর জায়গা হিসেবে সবার চেয়ে যেন আলাদা। এখানে না আছে তুষারঢাকা হিমালয়ের সৌন্দর্য, না পাওয়া যায় বেলাভূমির ওপর আছড়ে পড়া নীল সমুদ্রের ঢেউ। এমনকি দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি, নদী-জলা-জঙ্গলে সাজানো রঙিন প্রকৃতি কিংবা মানুষের হাতে পরিপাটি করে বানানো শহরও এখানে নেই। পবিত্র ধর্মস্থান হিসেবেও রাজস্থানের মরু অঞ্চল বাঙালির কাছে বিশেষ পরিচিত নয়। তাই মরুভূমিতে আমার শীতের ছুটি কাটানোটা বন্ধুদের কাছে এক মজার উপকরণ হয়ে উঠেছিল।

একদিন আগে জয়পুর পৌঁছে শহরটাকে একটু ঘুরে দেখব বলে ঠিক করলাম। উনত্রিশ ডিসেম্বর জয়সলমীরের ক্যাম্পে রিপোর্টিং করার কথা থাকলেও পঁচিশ তারিখেই হাওড়া থেকে ট্রেন ধরেছিলাম। কিন্তু বিধি বাম। শীতকালে উত্তরভারতের দূর্ভেদ্য কুয়াশায় ট্রেন লেট করল আঠেরো ঘন্টা! তবু ট্রেনটা যে বাতিল করা হয় নি এই ভেবেই নিজের মনকে সান্তুনা দিলাম। জয়পুরে তুদিনের হোটেল বুক করা থাকলেও সময় পেলাম বিকেলের দিকে মাত্র পাঁচ ঘন্টা। তখন সমস্ত বিখ্যাত ফোর্টের দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র শহর থেকে কিছুটা দূরে রাজস্থানী ঘরানায় সাজানো নকল গ্রাম তৈরি করা হয়েছে, সেটুকুই দেখে আসার সময় পাওয়া যাবে। হোটেল ম্যানেজার চউজলদি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। সাজানো গ্রাম চৌখি ধানিতেই রাজস্থানী সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা পরিচয় করে, রাজস্থানী খাবারে ডিনার সেরে হোটেলে ফিরে এলাম। ম্যানেজারকে বিদায় জানিয়ে রাতেই জয়সলমীরের ট্রেন ধরতে হল।

২৯ ডিসেম্বর ২০১৪

জয়সলমীরের হোটেলটা জয়পুরের মত অতটা ভালো নয়। একটু মর্নিং ওয়াক করে, স্নান সেরে সক্কাল সক্কাল বেড়িয়ে পড়াই ঠিক হবে বলে মনে হল। আসলে হোটেলটা মোটামুটি বড় হলেও খাওয়া দাওয়ায় রাজস্থানী ছাপ পেলাম না। আর আগের দিন যেভাবে মাত্র দশ মিনিট গাড়ি চাপিয়ে, এক কিলোমিটারেরও কম ঘুরিয়ে ১৫০০ টাকা নিয়ে নিয়েছিল, তাতে আমার সত্যিই খারাপ লেগেছিল। সকালে ইয়ুথ হোস্টেল ক্যাম্পে ফোন করে জানতে পেরেছিলাম, যে কোনো সময়েই এন্ট্রি নেওয়া যায়। তাই হোটেল থেকে না থেয়েই বেরিয়ে পড়লাম ক্যাম্পের দিকে। চেক-আউটের সময় হোটেল ম্যানেজার আপ্যায়ন কেমন হয়েছে তা জানতে চাইল। অসন্তোষের কথা রাখঢাক না করে সোজাসুজি বলেই ফেললাম। তাতে ম্যানেজার বিশেষ লক্ষিত হয়ে ক্ষমা চাইলেও আমার বিশেষ কিছু ভাবান্তর হল না। রুমে একটু খাওয়ার জলও দেওয়া হয় নি জেনে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার নিয়ে এল। তারপর বিনা পয়সায় ইয়ুথ হোস্টেল ক্যাম্পে পৌছে দেওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থাও করে দিল। একদিন আগে হোটেলে আসায় জয়সলমীরের সোনার কেল্লা, পটোয়া কি হাভেলি আর রাজবাড়ি দেখে নিতে পেরেছিলাম। এদিন সকালে মর্নিং ওয়াকের সময় নিরিবিলিতে গড়িসার লেকে সকালের সূর্য ওঠাও দেখে নিলাম। এখানে থেকে এটুকুই প্রাপ্তি। বর্ডার হোমগার্ড গ্রাউন্ড জয়সলমীর শহরের বাইরের দিকে, কেল্লা থেকে কিছুটা দ্রো। সেখানেই ইয়ুথ হোস্টেলের তরফে ক্যাম্প করে ডেসার্ট ট্রেকিং ও ফ্যামিলি ক্যাম্পিং এর আয়োজন করা হয়েছে। ক্যাম্প শুরু হরেছে ২১ তারিখ, চলবে জানুয়ারির ৪ তারিখ পর্যন্ত। আমার ২৯ তারিখের বুকিং থাকলেও শুনলাম এই সময়ের মধ্যে যে কোনোদিন চলে এলেই ওরা ক্যাম্পে থাকতে দেয়। আর সন্তব হলে "অ্যাডজান্ট" করে ট্রেকিং এর ব্যবস্থাও করে।

সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বর্ডার হোমগার্ড গ্রাউন্ডে পৌঁছে গেলাম। ক্যাম্পিং এরিয়ায় ঢোকার মুখেই রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক। সেখান থেকে আমায় ৪ নম্বর টেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হল থাকার জন্য। টেন্টটা বেশ বড়, অনায়াসে দশ-বারো জন থাকা যায়। আমার আগেই সেখানে বেশ কিছু মেম্বার পৌঁছে গেছে। ইন্দোরের সন্তোষ আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমাকেও ৪ নম্বর টেন্টের সদস্য করে নেওয়া হল। এক চিলতে খালি জায়গা দেখে আমার রুকস্যাকটা রাখলাম। ক্যাম্প ডিরেক্টর রতনজীর সঙ্গে দেখা করে নিয়ম-কানুনগুলো একটু জেনে নিলাম। এমনিতে খাওয়া-দাওয়া সব নিরামিষ, এছাড়া নিয়ম বলতে জল যেন অপচয় করা না হয়। ক্যাম্প এরিয়ায় একদিকে ফ্যামিলি ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রেকারদের সেদিকে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হল। এছাড়া অ্যালকোহল ও সিগারেট খাওয়া নিষেধ, এ ব্যাপারে ইয়ুথ হোস্টেল কর্তৃপক্ষ ভীষণ কড়া। ক্যাম্পিং এরিয়াটা একটু ঘুরে দেখতে গিয়ে চোখে পডল বেশ কয়েক রকম টেন্ট রয়েছে – আয়োজক ও ক্যাম্প লিডারদের জন্য এক ধরনের টেন্ট, ফ্যামিলি ক্যাম্পার্সদের আবার আলাদা ব্যবস্থা। ট্রেকারদের টেন্টেরও আবার রকমভেদ আছে – কোনটা শুধু মেয়েদের জন্য বরাদ্দ, কোনোটা ফিরতি ট্রেকারদের। কিছু টেন্টে বিছানাপত্তর রাখা আছে। মাঝে একটা বড় সামিয়ানা টাঙিয়ে মঞ্চ করা হয়েছে। আর একটা বড় টেন্টে রান্নাঘর। একটা গাছের তলায় অনেকগুলো চার্জিং পয়েন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে, নিজের ইচ্ছেমতন মোবাইল, ক্যামেরা চার্জ দিয়ে নাও। সমস্যা হচ্ছে একই রকম মোবাইল বা ক্যামেরা চার্জার হলে ভুল হওয়ার ভীষণ সম্ভাবনা, যেমন আমার ক্যামেরার চার্জার আরেকজন ভুল করে নিয়ে চলে গেছিল। একটা গাছের তলায় একটু উঁচুতে একটা জলের ট্যাঙ্ক রাখা আছে, সেই জল আধুনিক পিউরিফায়ার দিয়ে "বিশুদ্ধ" করে বড় বড় তুটো ড্রামে ভরা হচ্ছে - ড্রামের গায়ে লেখা "Drinking Water"। আরেক দিকে একটা গাছতলায় কল লাগানো কয়েকটা ড্রামে জল রাখা আছে যেগুলো বাসন মাজা বা হাতমুখ ধোওয়ার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ড্রামের পাশেই একটা বড় সুইমিং পুল, যাতে এক ফোঁটাও জলের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। সুইমিং পুলটা বেশ গভীর। ক্যাম্প এরিয়ার পেছন দিকে সার বেঁধে "টেন্ট" টয়লেট, ভেতর থেকে চেন টেনে দিলেই দরজা বন্ধ, আর প্রতিটি টয়লেটেই সব সময়ের জন্য জলের ব্যবস্থা আছে।

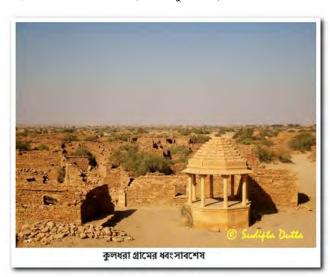
রেজিস্ট্রেশন ডেক্কের কাছেই প্রথম তুদিনের কর্মসূচী দেওয়া আছে। তাতে বেশ কয়েকঘন্টা রাখা আছে "City Visit" এর জন্য। বাঙালি স্বভাব আড়াবাজ। মাঝে যে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে তার নীচে বসেছে আড়ার আসর। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গোলাম সেদিকে। যথারীতি আড়ার আসরটাও জমিয়ে বসিয়েছে বাঙালিরাই। আমিও বসে গোলাম সেই আসরে। ওঁরা একটা গ্রুপ করে এই ট্রেকিং-এ এসেছেন, আজ ফিরে যাছেন। একটা বাঙালি পরিবেশ পেলাম, কিন্তু তা খুবই কম সময়ের জন্য। তবে ওই গ্রুপেরই একজন, ট্রেন লেটের জন্য আটকে পড়েছে, সে এসে আমাদের গ্রুপেই যোগ দেবে বলেও জানতে পারলাম। একটু পরেই তিনি পৌছেও গোলেন। মৃণালদা চুঁচুড়ার ডাকাবুকো লোক। সাতচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর অনেক ট্রেকিং-এর অভিজ্ঞতা হয়েছে। আড়ার আসর জমিয়ে দিতে এমন লোকের জুড়ি মেলা ভার। বন্ধুদের বিদায় জানানোর পর আমরা নিজেরাই এক অলিখিত জুটি বেঁধে ফেললাম। টেন্টের একটি ছেলেকে দেখলাম একটু একা পরে গেছে, কথা বলার বিশেষ কেউ নেই।



ছেলেটা চেন্নাই থেকে এসেছে, হিন্দি এক্কেবারেই বলতে পারে না, আর বেশিরভাগ কথা বুঝতেও পারে না। তাই সকলের সঙ্গে মানিয়ে উঠতে পারেনি। নাম জিগ্যেস করতে বলতে শুরু করল – রুশ্যেন্দ্র চন্দ্রশেখর ... মৃণালদা তাড়াতাড়ি থামিয়ে বলল, "আমি অত বড় নাম ডাকতে পারব না, ছোট করে ডাকব 'ভাই'। আচ্ছা 'ভাই' কে তামিলে কি বলে?" জবাব এল – "আন্না" (আসলে আন্না বলতে "দাদা"কে বোঝায়)। সেই থেকে রুশ্যেন্দ্র পাকাপাকিভাবে "আন্না" হয়ে গোল। তুপুরে সাড়ে বারোটায় লাঞ্চ দিয়ে দেওয়া হল। ঘিয়ে ভাজা ধবধবে সাদা আতপ চালের ভাত, সঙ্গে ডাল আর পকোড়া। আবার রুটি ও আলুর একটা তরকারিও ছিল। শেষ পাতে ঘিয়ে ভাজা এক ধরনের মিষ্টি। সবরকমই টেস্ট করে দেখলাম। রান্না বেশ ভালো। খেতে খেতেই রতনজীর কাছে জানতে পারলাম কাছাকাছি একটি ঐতিহাসিক গ্রাম আর একটা জৈন মন্দির আছে। হোমগার্ড গ্রাউন্ডের ঠিক সামনেই অস্থায়ী অটোস্ট্যান্ড তৈরি হয়েছে। তিনশ টাকায় একটা অটো বুক করে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম স্বল্পপরিচিত সেই ট্যুরিস্ট স্পটের দিকে।

অটো এগিয়ে চলল স্যাম রোড ধরে, সোনালি বালিরাশির বুক চিরে। তুপাশে ধূ-ধূ মাঠ আর তাতে অসংখ্য কাঁটাঝোপ। আকন্দের সারি ছাড়াও ছিল আরও অনেক রকমের ক্যাকটাস। সেই কাঁটাঝোপেই নিজের খাবার খুঁজে নিতে ব্যস্ত ভেড়ার পাল। এখানকার ভেড়াগুলো তুলনামূলকভাবে কম "ফরসা", আর এদের মুখটা পুরোপুরি কালো; রূপের মধ্যেও যেন অস্বাভাবিক গরমের প্রতিফলন ফুটে উঠেছে।

কুলধরা গ্রামে যখন পৌঁছলাম তখনও ভর দুপুর। গ্রামে ঢোকার সময় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া থেকে মাথাপিছ ২০ টাকা করে এন্টি-ফি নেয় আর অটোর জন্য তিরিশ টাকা। একটা পরিত্যক্ত গ্রাম -গ্রামের মাঝে একটি পুরানো মন্দির আর তাকে ঘিরে কোনও রকমে দাঁডিয়ে থাকা দুয়েকটি ঘর। বাকি অঞ্চল জুডে গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরটা সোনালি পাথরের আর তার কারুকাজ খুবই সুক্ষ্ম এবং বেশ সুন্দর। মন্দিরের ছাদে উঠতে এক জায়গায় লোহার পাত বেরিয়ে থাকতে দেখে বুঝলাম মন্দির চতুরটি সংস্কার হয়েছে। সেখান থেকেই দেখলাম একটি ছোট ঘূর্ণি, বালি ওডাতে ওডাতে এগিয়ে আসছে, নিতান্তই ছোট বলে চিন্তার কারণ নেই, তবে এটাই হয়তো ধ্বংসাত্মক মরুঝড়ের ছোট সংস্করণ। মন্দির লাগোয়া ভাঙা বাড়ির একটিতে ছাদ পর্যন্ত ওঠা যায় কিন্তু তার সিঁড়ি বলতে দেওয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা কিছু ঝুলন্ত পাথর আর কার্ণিশের ওপর দিয়ে পেতে রাখা একফালি পাথরের টুকরো, যা পার করার সময় নীচের দিকে তাকাতেও সাহস হয় না। ছোট ছোট বাচ্চারা মাঝে মাঝেই ঘিরে



ধরছে গ্রামের ইতিহাস শোনানোর জন্য। জনশ্রুতি, অত্যাচারী রাজপুত রাজা সালিম সিং এই গ্রামের মুখিয়ার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু গ্রামের লোকজন ছিল কুলীন ব্রাহ্মণ। তারা এই বিয়ে মেনে নিতে রাজি ছিল না। তাই রাতের অন্ধকারে রাজা মেয়েটিকে নিয়ে নিঃশব্দে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, আর যাওয়ার আগে অভিশাপ দিয়ে যায় যে এই গ্রামে কেউ কোনোদিন বসতি গড়তে পারবে না। পরদিন রাজা সালিম সিং এসে গ্রামে কাউকে না পেয়ে ভীষণ রেগে আশপাশের পঁচাশিটি গ্রামকেও জনশূন্য করে দেয়। সেই থেকে পুরো অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। আমার পক্ষে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার কোনো উপায় ছিল না, তবে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এই জনশ্রুতিই সবচেয়ে প্রচলিত। মন্দিরের খুব কাছেই সেই মুখিয়ার বাড়ি, এবং পুরো অঞ্চল ঘিরে রয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ির ভাঙা অংশ। কেমন যেন এক ভৌতিক অনুভূতি মনকে গ্রাস করে।

কুলধরা থেকে ফেরার পথে পেলাম অমর সাগর লেক। নামেই লেক, জলের ছিটে-ফোঁটাও চোখে পড়ল না। কাছেই এক জৈন মন্দির। জৈন তীর্থঙ্কর পার্থনাথের এই মন্দির ১৯২৮ সালে তৈরি করেছিলেন পটোয়া হিশ্বত রাম। আদি মন্দিরটি ভেঙে যাওয়ার পর পাশেই নতুন করে আবার তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। এখানেও জয়সলমীরের পটোয়া কি হাভেলির মত সোনালি পাথরের ওপর অনিন্দ্যসুন্দর কারুকাজ দেখতে পেলাম। ক্যাম্পে ফিরে আসার পর অটোচালক এক নতুন বাহানা শুরু করল। তিনশ টাকার কথা অস্বীকার করে হঠাৎই ছ'শ টাকা দাবি করে বসল! শেষমেশ সাড়ে তিনশ টাকায় ছাড়া পাওয়া গেল। বুঝতে পারলাম, এই যাত্রায় সব জায়গায় সততার দেখা নাও মিলতে পারে। বিকেলে চায়ের পর প্লিপিং ব্যাগ আর রুকস্যাক দিয়ে দেওয়া হল। আমি শুরু রুকস্যাক নিলাম – ব্লিপিং ব্যাগ আমার সঙ্গেই ছিল। পরের ক্যাম্পের জন্য ব্লিপিং ব্যাগ সোরের পাওয়া যাবে। সাতটা বাজতে না বাজতেই ভিনার দিয়ে দিল। এরপর ক্যাম্প ফায়ারের সময়। কিন্তু ক্যাম্পের মধ্যে আগুন জ্বালা নিষেধ। তাই বাল্বের আলোতেই "ক্যাম্প ফায়ার" শুরু হল। ক্যাম্প লিডারের ছোট্ট বক্তব্যের পর কেউ গান গাইলেন, কেউ বা আবার আধুনিক হিন্দি গানের তালে নাচ করে আসর জমিয়ে দিলেন। গোয়ার আলভা ম্যাডাম লাফিং ক্লাবের মেম্বার, তিনি বিভিন্ন রকমের হাসির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করালেন। আমরা মুচকি হাসি, অট্টহাসি, দমফাটা হাসি, কান এঁটো করা হাসি, খিলখিলে হাসি আর দাঁত বের করে এক রকমের হাসির ব্যায়াম করেছিলাম। আলভা ম্যাডামও সবগুলো আমাদের হেসে দেখিয়েছিলেন! গ্রুপের সবার সঙ্গে বেশ হাসতে হাসতেই পরিচয় হয়ে গেল আর কী – আঠেরা থেকে পঁয়্বাটি, সব বয়্বসের ট্রেকারই রয়েছে এই অ্যাডভেঞ্চারে।

রাতে হঠাৎই ঠাণ্ডা নেমে এল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আর হাড়কাঁপানো শীত, টেন্টের বাইরে বের হওয়াও বেশ কঠিন মনে হল।

৩০ ডিসেম্বর ২০১৪

সক্কাল সক্কাল উঠে পড়া আমার অভ্যেস। এখানেও ভোররাতে ঘুম ভেঙে গেল। চায়ের পর হান্কা ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেরে নেওয় হল বর্ডার হোমগার্ড গ্রাউডে। এর পর ক্যাম্প পরিষ্কার করা বাধ্যতামূলক। ব্রেকফাস্টের পর বাসন ধুতে গিয়ে দেখি তুজন ভদ্রলোক মেস টিন ধুয়ে নিচ্ছেন। মেস টিন সাধারণতঃ বাঙালিরাই বেশি ব্যবহার করে বলেই আমার ধারণা। পরিষ্কার বাংলাতে জিগ্যেস করেই ফেললাম – "বাঙালি নাকি"? তুজনেই আমার দিকে খানিক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বাংলাতেই উত্তর দিলেন – "কি করে বুঝলেন"? প্রচন্ড কুয়াশায় ট্রেন লেট থাকায় রায়গঞ্জের অভিজিৎদা আর সুদীপদার আসতে আসতে একদিন দেরি হয়ে গেছে। ওঁরাও আমাদের সঙ্গেই ট্রেকিং-এ যোগ দেবেন। ব্রেকফাস্টের পর সব্বাইকে "সুইমিং পুলে" যাওয়ার জন্য ডাকা হল! ওখানেই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। ক্যাম্প ডিরেক্টর রতনজী আমাদের নিয়মগুলো আবারও মনে করিয়ে দিলেন। প্রত্যেককে শালীনতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হল। ট্রেকারদের মধ্য থেকে একজন টিম লিডার ও একজন ডেপুটি লিডার বেছে নেওয়া হল। টিম লিডার সবার শেষে আসবে ও কেউ যাতে দলছুট না হয়ে যায় তার দিকে নজর রাখবে। ডেপুটি লিডার সবার ভালোমন্দের খবর রাখবে। বাঙালি হিসেবে গর্ব হল যখন রতনজী বললেন যে একমাত্র বাঙালিরাই ট্রেকিং-এ যাওয়ার আগে পড়াশোনা করে আসে! এর পর মরুভূমির বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে, সব ট্রেকারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ইয়ুথ হোস্টেলের নিজস্ব এক-তুই-এক-তুই-তিন স্থাইলের হাততালির মাঝে বক্তব্য শেষ করলেন। লাঞ্চের আগে কিছু সময় হাতে থাকায় আমরা আরও একবার শহরটাকে ঘুরে গড়িসার লেকের বড় বড় গুড়ওয়ালা মাণ্ডর মাছ, সালিম সিং-এর হাভেলি আর পুরোনো রাজপ্রাসাদ দেখে এলাম। লাঞ্চের পর চার-পাঁচ দিন ট্রেকিং-এর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ইয়ুথ হোস্টেলের দেওয়া ছোট রুকস্যাকে ভরে, বাকি জিনিসপত্র জমা রেখে এলাম। মরুভূমির সামনে পৌছে দেওয়ার জন্য বাস রেডিই ছিল। ক্যাম্পের সব্বাই আমাদের আটার্ন জনের ট্রেকিং টিমকে বিদায় জানিয়ে বাসে তুলে দিলেন।



বিকেল তিনটে নাগাদ যখন বাস ছাড়ল, তখনও তুপুর রোদের ঔজ্জ্বল্য একটুও কমেনি, তবে শীতকালের নরম রোদে ঠাণ্ডার আবেশ মেশানো এক মনোরম পরিবেশ পেলাম। পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে খারারায় বাস থেকে নেমে দেখি এক পাশে ধূ ধূ মরুভূমি আর অন্য দিকে কালো পিচে ঢাকা হাইওয়ে। তু-একটা ট্যুরিস্ট টেন্টও চোখে পড়ল। এখান থেকেই শুরু হবে পায়ে পায়ে মরুভ্রমণ। প্রথম মরুক্যাম্প এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। ক্যাম্প-লিডার ভরতজী আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চললেন, আর আমরা লম্বা লাইন করে তাঁর পেছন পেছন এগোলাম। মরুভূমির সীমানার দিক হওয়ায় এখানে বেশ কিছু বড় বড গাছ চোখে পডল। কিছুদূর এগোতে না এগোতেই দেখলাম পেছনের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরেছি। তবে ভরতজী সঙ্গে থাকায় নিশ্চিন্ত ছিলাম। একজনের মোবাইল হারিয়ে যাওয়ায় একটি গ্রুপ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। পুরো লাইনের ওপর ঠিকঠাক নজর রাখতে না পারার জন্য টিম লিডার বেচারাকে মৃতু ধমকও শুনতে হল! কিছুক্ষণ পরেই খাবা বা খাম্বা

ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম। কোনও রাস্তা না থাকলেও ছোট ছোট মোটর ভ্যান, বালির ওপর দিয়ে খাওয়ার জিনিসপত্র নিয়ে এখানে পৌঁছতে পারে। ক্যাম্প বলতে একটা ছোট পাকা ঘর যা আসলে স্টোর রুম, আর কয়েকটি টেন্ট। ক্যাম্প লিডার ভরতজী প্রথমেই ছেলে ও মেরেদের আলাদা টেন্টে ভাগ করে দিলেন। আর টয়লেট? "লড়কে লোগ বাঁয়ে তরফ আউর লড়কি লোগ ডাঁয়ে তরফ জাইয়েগা!" আর কোন ভাবেই যেন এর অন্যথা না হয়। তাকিয়ে তুদিকেই ফাঁকা মাঠ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না! প্রত্যেকে নিজেদের টেন্ট বেছে নিলাম। আমরা চার বাঙালী একই টেন্টে জায়গা করে নিলাম। ইয়ুথ হোস্টেলের তরফ থেকে রাতের স্থিপিং ব্যাগ দিয়ে দেওয়া হল।

খাবা জায়গাটা ঠিক মরুভ্মির মধ্যে বলা যায় না, বরং কিছুটা লোকালয় ঘেঁষা। কিছুটা দূরে একটা গ্রামও আছে। কাছাকাছি কিছু চাষের জমিও আছে। সরাসরি চোখে না পড়লেও হাইওয়ে খুব বেশি দূরে নয় আর তার পাশে পর্যটকদের জন্য গড়ে ওঠা টেন্ট-হোটেল থেকে গানবাজনার আওয়াজ ভেসে আসছিল। মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া হাইটেনশন ইলেকট্রিক লাইন গভীর নীল আকাশকেও যেন আষ্টেপৃষ্টে রেঁধে ফেলেছিল। যাত্রাপথের পরের অংশ সম্পর্কে এখন থেকেই সন্দিহান হয়ে পড়লাম। বিকেলে আমরা মরুভ্মির শেষ সীমানায় সূর্যান্তের সৌন্দর্য দেখব বলে কিছুটা দূরে একটা টিপির দিকে এগিয়ে চললাম। টিপির পেছনেই চাষের জমি। বড় বড় কিছু সোলার প্যানেলে পাম্প চালিয়ে মাটির বছ নীচে জমে থাকা জল তুলে এনে চাষের কাজে লাগানো হয়। একটা বড় রিজার্ভার বানানো হয়েছে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য, তবে তা বেশিরভাগ সময় খালিই পড়ে থাকে। ফসল তুলে এনে রাখার জন্য দুটো ছোট খড়ের ছাউনিওয়ালা পাকা খামার-ঘর বানানো হয়েছে।

কোথায় দিগন্ত, বরং দূরে ইলেকট্রিক তার আর গ্রামের সীমারেখার পেছনে কিছুটা অনাড়ম্বর ভাবেই সূর্যান্ত হয়ে গেল। তবে অন্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা মন ছুঁয়ে গেল। পড়ন্ত বিকেলে আবার বিনা আগুনে "ক্যাম্প ফায়ারের" ব্যবস্থা হল। তবে এখানে অনুষ্ঠানটা পরিচয়পর্ব আর অভিজিৎদার একটা সুন্দর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির মধ্যেই শেষ হল। সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার নামার আগেই ক্যাম্পে ফিরে আসতে হয়, নয়তো দিক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

দিনের আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গেই জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা নেমে এল। "রাত" আটটার মধ্যে ডিনার রেডি। ক্যাম্পে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। খাওয়ার সময় সঙ্গের হেডল্যাম্পটা জুলে নিলাম। রাতের খাবারে ভাত, ডাল ছাড়াও রয়েছে পুরি আর আলুর দম। পরিষ্কার রাতের আকাশে তারার ঝিকিমিকি আর উজুল চাঁদের আলো এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করল। দিগন্ত প্রসারিত আকাশের প্রতিটি তারাই মিটমিট করে জুলে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য খুব তাড়াতাড়ি টেন্টে আশ্রয় নিতে হল। স্লিপিং ব্যাগে আশ্রয় নিতে গিয়ে দেখি তাতে সাইড চেনটা কাটা। অগত্যা জ্যাকেটের ওপর দিয়েই সেটাকে চাপিয়ে নিলাম। ভোররাতে বাইরে বেড়িয়ে দেখি আকাশ যেন আরও পরিষ্কার, প্রতিটা ছায়াপথও খালি চোখে ধরা পড়ে।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

ধোঁয়া, ধুলোবালিহীন পরিবেশে ভোরের সদ্য ফুটে ওঠা সূর্য অনেক নির্মল। এখানে সকাল হয় অনেক দেরিতে, প্রায় সাড়ে সাতটা। বাইরে বেড়িয়ে দেখি একটা উট বসে জাবর কাটছে, পরবর্তী গন্তব্যে ও আমাদের সাথী। উটের মালিক খেরো সিং আসলে মেষপালক। "সিজনে" উটের সওয়ারিতে কিছু আয় করে নেয়। অভ্যাসমত উটের নাম জিগ্যেস করেই ফেললাম, জবাব এল "রাজু"! এর আগে অমরনাথে প্রায় সব ঘোড়ার নামই পেয়েছিলাম রাজু, এখানে উটেরও তাই! লাঞ্চপ্যাকে ঘিয়ে ভাজা পুরি আর আলুর দম ভরে নিয়ে রেডি হলাম আজকের যাত্রা শুরুর জন্য। ভরতজী এক বিদায়ী ভাষণ দিলেন এবং "চিলিমিলি ঝিলিমিলি ধুম-ধুমাকা, হু-হা হু-হা..." এক আজব স্লোগানে আমাদের যাত্রা শুরু হল। "রাজু" উট পিঠে আমাদের খাওয়ার জল আর নিজের খাবার নিয়ে সবার সামনে গাইড হিসেবে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল! আর খেরো সিং পেছনে



আমাদের দেখভাল করতে করতে তাকে অনুসরণ করল। ঘন্টা তুয়েক বালিপাথরের ওপর দিয়ে হাঁটার পর একটা বালিয়াড়ির সামনে জিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হল।এখানে তুদিকে তুটো রাস্তা চলে গেছে। একটা পাথুরে, গাড়ি চলাচলের রাস্তা অন্যটা বালিপথ। উটকে খেতে দেওয়া হল। খাওয়ার পর এক আজব কায়দায় ও জাবর কাটতে লাগল। প্রথমে সামনে থাকা একটা পিলারে গলাটা ঘষে নিচ্ছিল, তারপর একটা ঢেঁকুর তুলে খানিক্ষণ জাবর কেটে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করছিল! সামনের বালিয়াড়িটার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। এই বালিয়াড়িটা আসলে পাহাড়ের ক্ষয়ে যাওয়া অংশ। যেদিক থেকে হাওয়া আসছে সেদিকে গুধুই মসৃণ বাদামী পাথর, আর হাওয়ার উল্টোদিকে গুধুই বালি। অনেকেই বালিতে ঝাঁপিয়ে, ডিগবাজি খেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বালিপাহাড়কে পেছনে রেখে বালিপথ ধরে এগিয়ে চললাম। এখানে মরুভূমি বলতে গুধুই বালি নয়, বরং সেই বালির মাঠে ছোট গুলনো ঝোপ পুঞ্জ পুঞ্জ করে সাজানো, অনেকটা ধানক্ষেত থেকে ধান কেটে নেওয়ার পর শুকনো গোড়াগুলো পড়ে থাকার মত। আর সেই শুকনো ঝোপেই চড়ে বেড়াচ্ছে হাড়গিলে চেহারার কিছু গরু। কিছুতুর এগোতেই চোখে পড়ল একদল বুনো উট, কাঁটাঝোপের থেকেই নিজের খাবার খুঁজে নিচ্ছে। জিন পরানো, লাগাম দেওয়া উটের মত এরা পরাধীন নয়। এক ধরনের ঝোপে সাদা ছোট ছোট ছুল ফুটে রয়েছে। আর খানিক এগোতেই "রাজু" উটের আবার খিদে পেয়ে গেল। একটা কাঁটাঝোপের পাতা কাঁটা না বেছেই দিব্য খেয়ে নিল। এর মাঝেই উটমালিক রাত্রিবেলায় ৩১ ডিসেম্বরের গার্টি আয়োজন করার প্রস্তাব

দিল। দশ হাজারের জায়গায় মাত্র হাজার সাতেক টাকা দিলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পাকিস্তানি গায়ক গায়িকারা আসর জমাবে। বুঝতে পারলাম আরও একবার প্রতারকের পাল্লায় পডতে চলেছি।



একঘেয়ে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বিরক্তিই লাগছিল। পাহাড়ি পথে প্রতিটি বাঁকে লুকিয়ে থাকে প্রকৃতির নতুন রূপ, সেই বৈচিত্র্য এই মরুপথে কোথায়? হঠাৎ কানে ভেসে এল "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে..."। আশ্চর্য হয়ে দেখি ইন্দোরের কবিতা ম্যাডাম ক্লান্তি ভুলতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শরণাপন্ন হয়েছেন। আমরা বাঙালিরাও তার সঙ্গে গলা মেলালাম। আরও কিছুটা হাঁটার পর রাস্তার প্রকৃতির এক আমূল পরিবর্তন দেখতে পেলাম। বালির ওপর দিয়ে কষ্ট করে হেঁটে সামনে দেখি কিছটা নীচু সমতল মক্তমি। এতক্ষণ বালি আর ছোট-বড ঝোপঝাড আমাদের সঙ্গী ছিল। কিন্তু নিচের যে মরুভূমি দেখতে পেলাম সেখানে ঝোপের কোন চিহ্নই নেই। জমি অনেকটা শুকনো বালিমাটির মত, আর বেশ কিছটা দরে দরে বড বড গাছ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা ছোট ঘর একা দাঁডিয়ে আছে। মানুষের অস্তিত্রে কোন লক্ষণই চোখে পড়ল না। একটা বড় গাছের ছাওয়ায় বসে

একটু জিরিয়ে নেওয়া গেল। ভরত্বপুরের রোদ চড়া হলেও জোরালো ঠাগু হাওয়ার জন্য বিশেষ একটা গায়ে লাগছে না। একটা চাতালের ওপর বসে তুপুরের লাঞ্চটা সেরে নিলাম। মরুভূমির বালি জীবাণুমুক্ত। রতনজীর টিপস মতো তাই দিয়েই লাঞ্চবস্তুটা মেজে নিলাম। তেলচিটে ভাবটা পুরো উধাও হয়ে গেল। খায়া ক্যাম্প থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে এই মরুদ্যানটির নাম "অম্বে কি বেড়ি"। একটি ছোট্ট কুয়ো আছে যার জল খালি জীবজন্তুদেরই খাওয়ানো হয়। "অম্ব"জীর নামাঙ্কিত একটা ফলকও চোখে এল। মন চাইছিল না সুন্দর মরুদ্যানটিকে ছেড়ে যেতে, কিন্তু আবার পাখুরে জমি ধরে এগিয়ে যেতে হল। তু-তিন কিলোমিটার যেতে না যেতেই আবার একটা খোলা মাঠের মাঝে গাছতলায় যাত্রাবিরতি নেওয়া হল। সঙ্গের খাওয়ার জল শেষ হয়ে এসেছিল। উটের পিঠে করে বয়ে আনা জার থেকে জলের বোতল ভরে নিলাম। জলটা কেমন যে ফেনা ফেনা। বেশ কয়েক ফোঁটা জিওলিন দিয়েও সেই জল খেতে সাহস পেলাম না। এক সময় আমরা গ্রাম্য পথ ধরলাম। সেখানে কিছু পাথরের মূর্তি আর নক্সাকাটা পিলার দাঁড় করানো দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম ক্রমশঃ শহরের কাছাকাছি পৌছে যাছি। গোবর্ধনের ক্রেত বলে এক জায়গায় কতগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে আমাদের ঘিরে ধরল। বয়স্করা সাপুড়িয়া বাঁশি বাজানো শুরু করল আর মেয়েরা তার তালে তালে জিপসি নাচ নাচল। এখানে এই বাঁশি পুলি বা পান্দি নামে পরিচিত। বাচ্চা ছেলেরা মোরচ্যাং নামে এক অদ্ভুত যন্ত্র বাজিয়ে শোনাল। এই ছোট্ট বাজনাটা মুখে নিয়ে বাজানো হলেও আসলে তারের যন্ত্র। ধনুকের ছিলাকে টেনে ছেড়ে দিলে যেমন শব্দ হয়, এর আওয়াজ অনেকটা সেরকম। একটু পরেই আমরা বালিঝড়ের কবলে পরলাম। কোনরকমে মাথা ঢেকে, গুটিসুটি মেরে মাটিতে বসে পরা ছাড়া উপায় ছিল না। আমাদের সৌভাগ্য যে মাঝ মরুভূমিতে ঝড়ের সঙ্গে আমরা স্যাম শহরে পরের ক্যাম্পে পিরৈছে গোলাম। "অম্বে কি বেড়ি" থেকে এই ক্যাম্প মাত্র চার কিলোমিটার দ্রে। ক্যাম্পে পৌছানো মাত্র ক্যান্স পালিত বার তার হাট ছেলেটি আমাদের স্বাগত জানাল।

সাম শহরের এক ধার ঘেঁসে তৈরি হওয়া ক্যাম্পটি ইয়ুথ হোস্টেলের নিজস্ব জমির ওপর বসানো। ক্যাম্পের মাঝে একটি বাঁধানো বড গোলাকার ঘেরা জায়গা। একপাশে আয়োজক, ক্যাম্প লিডার ও মেয়েদের টেন্ট আর রান্নাঘর। অন্যদিকে ছেলেদের টেন্ট। মেয়েদের জন্য একটি পাকা টয়লেট তৈরি হচ্ছে, যা কোনরকমে ব্যবহার করা যায়। ছেলেদের জন্য এবারও ক্যাম্প এরিয়ার বাইরে খোলা মাঠ। দুটি সাময়িক টেন্ট-টয়লেট বসানো হয়েছে বটে. তবে ঝোডো হাওয়ায় পর্দার আর কোনও অস্তিতই নেই। শহরের মধ্যে এরকম টয়লেট বিহীন ক্যাম্প দেখে সবাই একটু অসম্ভুষ্টই হল। নিজেদের টেন্ট গুছিয়ে ব্যাগ পত্তর রেখে ক্যাম্প লিডারের সঙ্গে আমরা চললাম একত্রিশে ডিসেম্বরের সাম শহরের উৎসবমুখর পরিবেশকে অনুভব করতে। শহরটা পাকিস্তান বর্ডারের খুব কাছাকাছি। ভারতের শেষ সীমান্ত থেকে বছরের শেষ সূর্যাস্ত দেখার জন্য কাতারে কাতারে মানুষ জমা হয় এই মরুশহরে। ক্যাম্প লিডারের কথায়



লাখ লাখ লোকের সমাগমে এই সময় ভারত ও পাকিস্তান যেন এক হয়ে যায়। শহরের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে টুরিস্ট টেন্ট। রাত পিছু কোনোটা পাঁচ হাজার, কোনোটা দশ হাজার, কোনটা বা তারও বেশি টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়। বাইরে থেকে টেন্টের আকৃতি দেওয়া হলেও ভেতরে যে কোন বড় হোটেলের বিলাসবহুল ঘরের সবরকম বন্দোবস্ত থাকে। প্রতিটি টেন্টেই বছরের শেষ রাতকে শ্মরণীয় করে রাখার জন্য নাচ গান সহ বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে সামের মূল আকর্ষণ হল মাইলের পর মাইল বিস্তৃত নিরবিচ্ছিন্ন বালিয়াড়ি। কোনোটা শুধুই বালির ঢিবি, কোনোটা বা অর্ধচন্দ্রাকার বার্খান। প্রতিটির গায়ে হাওয়ায় আঁকা সুদৃশ্য নক্সা। তবে অসংখ্য পর্যটকের ভিড়ে আর উটের পায়ের ছাপে প্রকৃতির এই অসামান্য শিল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে গেছে। পাছে নক্সাগুলো হারিয়ে যায় তাই বালির ওপর পা ফেলতেও আমাদের মায়া হচ্ছিল। অথচ লাখ পর্যটক সেই বালির ওপর নেচে, গড়িয়ে, বালি ছুড়ে এক অলীক আনন্দ উপভোগ করছিল। হয়তো আবার হাওয়া দিলেই নতুন এক শিল্প ফুটে উঠবে, তবু এক শিল্পের করুণ পরিণতি দেখে মনটা ভারী হয়ে উঠল। গোবর্ধনের ক্ষেতের সেই জিপসি নাচিয়ে দলটিকে এখানেও দেখতে পেলাম।



সূর্যাস্ত এখানে ভারি মনোরম, গোল থালার মত সূর্য দুষ্টু হাসি হেসে বালিয়াড়ির পেছনে টুক করে লুকিয়ে পড়ে। আকাশ সামান্য মেঘলা থাকায় একটু তাড়াতাড়িই সূর্যাস্ত হয়ে গেল। দিনের শেষে খানিক ক্লান্তই লাগছিল তাই বেশি দেরি না করে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। এসে শুনলাম উটওয়ালা সাত হাজার টাকায় রফা করলেও শেষমেশ দশ হাজারের কমে রাতের অনুষ্ঠান করতে শিল্পীরা রাজি হয়নি। তাই অতিরিক্ত টাকা দিয়েই পাকিস্তানি শিল্পীর নাচ গানের আয়োজন করা হয়েছে। আগের রাতের কষ্টকর অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি এড়াতে নিজে বেছে স্টোর রুম থেকে রাতের স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে নিলাম। রাতের খাবারটা একটু তাড়াতাড়িই খেয়ে নেওয়া হল। ডিনারে ঘিয়ে ভাজা ভাতের সঙ্গে নিরামিষ সবজি তো ছিলই, তবে ঘিয়ে ভাজা রুটির সাথে এক নতুন ব্যঞ্জন পেলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম তরকা. কিন্তু খেতে গিয়ে বুঝলাম স্বাদ একটু কষা। জিগ্যেস করে জানতে পারলাম মেথির সবজি। এদের একটা কমন রেসিপি হল কোনও খাবারকে সেদ্ধ করে জল ফেলে ঘিয়ে ভেজে নেওয়া। মেথির সবজিও সেভাবেই বানানো

হয়েছে। তবে খেতে খুব খারাপ লাগে না, আর শুধু মেথি দিয়েই যে কোনো ব্যঞ্জন হতে পারে তা আমার কম্পনাতেও আসে নি। শেষপাতে অবিকল পাটালি গুড়ের মত দেখতে ও খেতে এক ধরণের মিষ্টি দেওয়া হল। রেসিপি জানতে গিয়ে বোকা বনে গেলাম, বেসনকে জলে ফুটিয়ে ঘি আর চিনি দিয়ে ভেজে নিয়ে এটি তৈরি। মিষ্টিটির আঞ্চলিক নাম মোহনথাল। রায়ায় ঘি-এর ব্যবহার দেখলে মনে হয় এখানে বোধহয় তা জলের চেয়েও সস্তা। ক্যাম্প লিভারের কাছে শুনলাম, বিয়ের পর নাকি এখানে মেয়েদের পয়তাল্লিশ দিনে চল্লিশ কেজি ঘি খাওয়ানো হয়, এটাই রীতি! রাতে ঠাগু বাড়ছিল, পরদিন সক্কাল সক্কাল রওনা দিতে হবে, তাই রাতের জলসায় না খেকে একাই টেন্টে গিয়ে শুয়ে পরলাম। পরে শুনেছিলাম দেশ-বিদেশ থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত পাকিস্তানি আটিষ্ট কিছু বলিউডি সিনেমার গান শুনিয়ে তুই ঘন্টার অনুষ্ঠান এক ঘন্টায় শেষ করে বিদায় নিয়েছেন। অনুরোধ সত্তেও নিজের দেশের গান বা আঞ্চলিক গানের একটা সুরও গাননি।

১ জানুয়ারি ২০১৫

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরের দিকে চেয়ে খানিক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ঘন কুয়াশায় চারদিক চেকে গেছে, দু-হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্যে কনকনে ঠাপ্তা হাওয়া বইছে - হাড়কাঁপানো শীত। হাতমুখ ধুয়ে উঠতে না উঠতেই টেন্টের পেছন থেকে শোরগোল ভেসে এল। গিয়ে দেখি বালির ওপর একটা সাপ নেতিয়ে পড়ে আছে। রাতের বেলা বেচারা খাবার খেতে বেরিয়েছিল, কিন্তু প্রচণ্ড ঠাপ্তায় বালির ওপরই জমে গেছে। সাপটা কিন্তু মরে যায় নি, শুধু স্থবির হয়ে পরেছিল। এক উৎসাহী ট্রেকার সাপের লেজ ধরে তুলে হাতে নিয়ে কিছু ফটো তুলে নিল। মানুষের হাতের গরম ছোঁয়ায় সাপটা মনে হয় একটু আরামই পেল।

ঘড়ির কাঁটায় আটটা বাজতে না বাজতেই ক্যাম্পের বাইরে সার বেঁধে উট এসে দাঁড়াল। এদিন প্রায় দশ কিলোমিটার উট সওয়ারি করতে হবে। এক উটে তুজন করে। আমি আর মৃণালদা একটা উটের পিঠে চেপে বসলাম। উট বসার থেকে উঠে দাঁডানোর সময় ব্যালেন্স করে তার



পিঠে বসে থাকাটা সওয়ারের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। হাঁটু মুড়ে উটটা প্রথমে সামনের দিকে এগিয়ে গেল, মুহূর্তের জন্য আমরা পেছনে হেলে গেলাম। সামনের দিকে ঝুঁকে ব্যালেন্স করতে যাব হঠাৎ উটটা পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হল এই বুঝি হুমড়ি থেয়ে পড়ে যাব। উট মহাশয় অবশেষে সামনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। লম্বা উটের সারি যখন রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছিল তা দেখতে রীতিমত ভিড় জমে গেল। ঠাগ্র জাঁকিয়ে পড়েছে, চারদিক কুয়াশা ঘেরা, তার মধ্যে তুদিকে তুপা ছড়িয়ে বসে থাকতে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছিল। লোকালয় পেরিয়ে উট এগিয়ে চলল গ্রামের রাস্তা ধরে। ফাঁকা মাঠ আসতেই হাওয়ার বেগ দিগুল হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল উটের পিঠে বসেই আমরাও সাপটার মত জমেই যাব। কেউ কেউ উটের পিঠ থেকে নেমে হেঁটে যাওয়াই শ্রেয় মনে করল। পথে একটা বড় গ্রাম পড়ল, ধারেকাছে কোনও নদী না থাকলেও এর নাম গঙ্গা গ্রাম, বড় একটা স্কুলও আছে। গ্রাম পেরিয়ে যখন আবার বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে চলা শুরু হল ততক্ষণে ঠাগ্রয় শরীর অবশ হয়ে গেছে। পরিস্থিতি প্রতিক্ল বুঝে বালিয়াড়ির মাঝেই উটগুলোকে থামানো হল। উটের পিঠ থেকে নামতে যাওয়াও আরেক ঝগ্রাট। উটের বসাটা, দাঁড়ানোর ঠিক উল্টোরকম, প্রথমে সামনের পা মুড়ে বসে পড়ে, তারপর ধীরে ধীরে পেছনের পা তুটো ভাঁজ করে নামিয়ে আনে, এক্ষেত্রে ব্যালেন্স রাখা আরও কঠিন। নামার পর পায়ে কোনো সাড় পেলাম না, দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম, একটা কাঁটাঝোপকে আঁকড়ে ধরেই কোন রকমে টাল সামলে নিলাম। উটওয়ালারা হাত পা সেঁকে নেওয়ার জন্য আগুন জ্বালিয়েছিল, অতিকষ্টে সেই আগুনের কাছে পৌছে হাত পায়ের আড়ন্ট ভাব কাটালাম। আমাদের উটকে যে ছেলেটা গাইড করে নিয়ে যাচ্ছিল, তার নাম আবতুল, বয়স খুব বেশি হলে পনেরো-ষোল। ওকে জিগ্যেস করে জানতে পারলাম এখানে উটদের বেশ আকর্ষণীয় নাম দেওয়াই রীতি। কখনও কখনও হিন্দি সিনেমার নায়কদের নামে উটের নাম রকেট।



যাত্রাবিরতির পর মৃণালদা আর উটের পিঠে উঠতে চাইল না, তাই আবতুল নিজেই আমার সামনে বসে গেল। বালির ওপর দিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই আবার পাকা রাস্তা দেখতে পেলাম। নির্জন রাস্তায় সারাদিনে হয়তো হাতে গোনা অল্প কয়েকটা গাড়িই চলে, কিন্তু রাস্তাঘাট ঝকঝকে তকতকে, মসৃণ। উটের পিঠ থেকে যেখানে নামানো হল জায়গাটার নাম "নিম্বা ফান্টা", যার অর্থ তুই রাস্তার সংযোগস্থল। কিছু বখশিশ দিয়ে উটওয়ালাদের বিদায় জানানো হল। এখান থেকে পাকা রাস্তা ধরে আমাদের হাঁটতে হবে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। চারদিকে ধু-ধু মাঠ থাকায় রাস্তাগুলো বানানো হয়েছে সরলরেখা বরাবর অভিজিৎদার কথায় "যেন স্কেল ধরে টেনে দিয়েছে"। খানিক দূর এগোতেই চোখে পডল "বালিয়াড়ির চলন"। শনশনে হাওয়ায় বালির রাশি উডে গিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বালির ঢিবি তৈরি করছে। সেই ছবি তোলার চেষ্টা করতে

গিয়ে আমার ক্যামেরায় বালি ঢুকে খারাপ হয়ে গেল। তুপুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা ফিকে হয়ে গেছে। চারদিকের কাঁটাঝোপে বাসা বেঁধে থাকা পার্পল সানবার্ডের সুরেলা ডাক কানে ভেসে আসছিল।

দুপুর তুটো নাগাদ আমরা সুদাসরী ন্যাশানাল পার্কে পৌছালে পরবর্তী ক্যাম্পের লিডার আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। এই পার্কটি ভারতের সবচেয়ে বড় ডেসার্ট ন্যাশনাল পার্ক। একটি কুঁড়েঘরের সামনে বসে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। সুদাসরী পার্ক মূলত বিভিন্ন পাথির জন্য বিখ্যাত। এখানে গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, বিভিন্ন প্রজাতির ঈগল, বাজপাথি আর শকুনের বাস। এছাড়া হরিণ, বিভিন্ন প্রজাতির গিরগিটি আর ডেসার্ট ফক্স তো আছেই। তবে বিশেষ সৌভাগ্য না থাকলে এতগুলো জীবের দেখা মেলে না। আমাদের ক্যাম্পটা এই পার্কের অনেকটা ভেতর দিকে। চলতে গিয়ে আবারও একবার জমির প্রকৃতির পরিবর্তন চোখে পড়ল। এখানে মাটি শক্ত পাথুরে, দূরে দিগন্তরেখায় কয়েকটা গাছের আভাষ পাওয়া যাছিল। কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে এক শুকনো মাটির পথ পেলাম। পাশে একটা গরুর কঙ্কাল চোখে পড়ল। বুঝতে পারলাম, গরুটা মরে যাওয়ার পর শুকিয়ে গোছে, কিন্তু পচন ধরে নি। এখানকার আবহাওয়ায় ব্যাকটেরিয়া বাঁচতে পারে না। পার্ক থেকে আরও তুতিন কিলোমিটার হেঁটে সুদাসরী ক্যাম্পে যখন পোঁছলাম তখন ঝোড়ো হাওয়া বইছে। টেন্টের ভেতরটা বালিতে ভর্তি, আর চেষ্টা করেও টেন্টের পর্দা আটকে রাখা যাছে না। অনেক কট্রে ইট চাপা দিয়ে টেন্ট ঠিক করে ভেতরটা পরিষ্কার করে নেওয়া হল। সুদাসরী ক্যাম্পটা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে, তবে এই মাঠে কিছু কাঁটাঝোপের গাছপালা আছে। শুনতে পেলাম কাছেই একটা গ্রামও আছে। তবে পার্কের মধ্যে গাড়ি চলার কোনও রাস্তাই নেই। এখানেও অন্য ক্যাম্পের মতই জল ব্যবহারে বিশেষ বিধিনিষেধ আছে। এক ড্রাম জল বাসন ধুয়ে নেওয়ার জন্য, আরেক ড্রাম খাওয়ার জল। একটা গরুন দেখলাম সবার অগোচরে খাওয়ার জলে মুখ দিয়ে গেল। সামনেই সুদাসরীর বালিয়াড়ি। ক্যাম্পের রাধুনি ছেলেটা আমাদের বালিয়াড়ি পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। ছেলেটার বাড়ি জয়সলমীরে, চোদ্দ-পনের বছর বয়সেই ওকে আয়ের পথ বছে নিতে হয়েছে।

গাছপালার আড়াল পেরোতেই আমরা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টির দিকে। লোকচক্ষুর আডালে এই বালিয়াডির প্রত্যেকটা স্তুপ নিখুঁত ভাবে তৈরি। প্রত্যেকটা ঢিপিই নক্সাকাটা। ফুরফুরে হাওয়াই যেন এখানে শিল্পী আর বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি তার আঁকার ক্যানভাস। ছোট ঝোপ বা খড়কুটো সবই তার ছবি আঁকার তুলি আর ইচ্ছেমতন এঁকে ফেলছে সুদৃশ্য বালির আলপনা। আকাশ মেঘলা বলে আলো কিছুটা কম, ক্যামেরায় ছবি হয়তো তত ভালো আসে না. কিন্তু আলো-আঁধারির মাঝে প্রত্যেকটা ঢিবি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চলমান অশরীরির মতই হাওয়ার স্রোতে হঠাৎই আবির্ভাব হয়, হাওয়ার ভাষায় ফিশফিশিয়ে ভাব বিনিময় করে, হাওয়ায় ভেসে রাতারাতি জায়গা বদল করে, আবার শেষে আপন খেয়ালে হাওয়ায় বিলীন হয়ে যায়। এখানকার বালিয়াড়ি অনেকটা মাটির রঙের, সাম ডিউনসের মত লালাভ সোনালি নয়, বালিও অনেক সুক্ষ্ম, হাওয়ায় সহজেই ভেসে বেড়ায়। পর্যটকের ভিড় না থাকায়



বালিয়াড়ির পুরোটাই অক্ষত। কেউ কেউ বালির ঢিবির ওপর শুয়ে-বসে, কেউ বা লাফিয়ে ঝাঁপিয়েই পুরো বিকেলটা কাটিয়ে দিল। মেঘের আড়ালে আমাদের অজান্তেই কখন যেন সূর্যান্ত হয়ে গেল।

ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার পথেই হালকা বৃষ্টি শুক্ল হল। শুকনো মক্নভূমিতে এই শীতের শুকনো আবহাওয়ায় বৃষ্টির মধ্যে পড়তে হবে এতটা আমরা কেউই ভাবতে পারি নি! জানতে পারলাম ঘন কুয়াশার পর এরকম বৃষ্টি খুব স্বাভাবিক, আর তা ভুট্টা চাষের জন্য ভীষণ জরুরিও। রাতের খাবারে ভাত ছাড়াও ছিল রাজস্থানের নিজস্ব রেসিপির ডাল বাটি আর চুরমা। তৃপ্তি করে রাজস্থানী খাবারে পেট ভরালাম। ঝোড়ো হাওয়া থেমে যাওয়ার পর রাতের আকাশে একটা-দুটো করে তারা চোখে পড়ল। জমাটি ঠাগুয় কারোরই আর বিনা আগুনে ক্যাম্প ফায়ার করার এনার্জি ছিল না। সাত তাড়াতাড়ি ব্লিপিং ব্যাগে আশ্রয় নিলাম।

২ জানুয়ারি ২০১৫

সকালের সোনালি রোদ টেন্টের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল। দেখলাম পরিষ্কার আকাশে কিছু সাদা মেঘ ভেসে বেড়াছে। মুম্বাই থেকে আসা প্রতীকের আজ জন্মদিন, ওকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলেই বার্থডে উইশ করা হল। পোহা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম পরের ক্যাম্পের দিকে। এখানে আমাদের গাইড ভূরে খাঁ আর তার উট 'রাজু'! আকাশ পরিষ্কার থাকায় এবার বালিয়াড়িগুলোকে অনেক উজ্জ্বল দেখাছিল। বালিতে হেঁটে যাওয়া ইঁতুরের পায়ের ছাপও পরিষ্কার বোঝা যাছিল। সুদাসরীর বালিয়াড়ির স্থানীয় নাম "গজই মাতার" বালিয়াড়ি। কাছেই একটা জৈন মন্দির। এদিন চলার পথে বেশ কিছু স্থানীয় লোকজন চোখে পড়ল। তুতিন কিলোমিটার যেতে না যেতেই একটা শুকনো জলাধারের পাশে বিশ্রামের জন্য ঘন্টা খানেকের বিরতি নেওয়া হল। বুঝতে পারলাম এদিন খুব বেশি দূর হাঁটতে হবে না। তুপাশে টিলার মাঝ দিয়ে এক পাথুরে পথের ছবি দেখে তুর্গম গিরিপাস বলে ভূল হতেই পারে।



কিছুদূর যেতে না যেতেই এক খোলা মাঠে বসে লাঞ্চ করে নেওয়া হল। আশপাশে বাড়িঘর না দেখতে পেলেও এটাই নাকি বর্ণা গ্রাম। পাশ দিয়ে হাইওয়ে চলে গেছে। মাঠের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ঝোপ জাতীয় কের বা কেইর গাছ আর তাতে অসংখ্য পাখির বাসা। মাঝে মাঝেই ইভিয়ান রোলার আর কালো রবিন পাখি চোখে পড়ছিল। অটোরিক্সায় এক ভ্রাম্যমাণ দোকান বসেছে, তাতে জল, তুধ থেকে চিপসের প্যাকেট সবই পাওয়া যাচ্ছিল, তবে দাম কিছুটা বেশিই। উটকে হাইওয়ে দিয়ে ক্যাম্পের দিকে পাঠিয়ে ভূরে খাঁ আমাদের সঙ্গে চললেন মেঠো পথে। রাস্তাটা শর্টকাট হতে পারে তবে রোমাঞ্চকর। অঞ্চলটা একটা ক্ষয়ে যাওয়া পাহাডের অংশ। বালিপথে মাঝে মাঝেই সাদা ফুলে ঢেকে যাওয়া একধরণের ঝোপ চোখে পড়ছিল। তুই পাহাড়ের মাঝে এক অগভীর খাত পেরিয়ে যেতে গিয়ে

বয়স্কদের অনেকেই হাঁপিয়ে পড়লেন। আসলে ঢাল বেয়ে নেমে আসা সহজ, কিন্তু বালিপথে চড়াই বেয়ে ওঠা বেশ শক্ত। পাহাড়ের ওপরে ওঠায় মাথার ওপর টহল দেওয়া ঈগলগুলাকে খুব কাছ থেকে দেখা গোল। অল্পদূর যেতেই আবার এক বালিয়াড়ির সামনে এসে উঠলাম। জায়গাটা বর্ণা ক্যাম্পের খুব কাছেই। বালির ওপর কিছু ছাপ দেখিয়ে ভূরে খাঁ জানালেন তা চিতাবাঘের পায়ের ছাপ। তুপুরের মধ্যেই এখানে পোঁছে যাওয়ায় বালির ঢিবিতে কাটানোর জন্য অনেক সময় পাওয়া গোল। রোদ চড়া হওয়ায় বালিও কিছুটা গরম হয়ে উঠেছে। মৃণালদা দেখাল বালির কিছুটা তলার আন্তরণ অনেক ঠাগু। প্রচণ্ড গরমে অভিযাত্রীরা অনেক সময় বালির মধ্যে ঢুকে তাপের হাত থেকে নিজেদের বাঁচায়। এখানে কয়েকটা ক্ষয়ে মসৃণ হয়ে যাওয়া পাথর চোখে পড়ল। সাম কিংবা সুদাসরীর থেকে অনেক কম জায়গা জুড়ে এই বালিয়াড়ি, রঙ কিছুটা হলদে, লোকালয়ের কাছে হলেও নিরিবিলি। তবে সুদাসরীর কাছে এর সৌন্দর্য যেন অনেকটাই ফিকে। তুপুরের রোদ থাকতে থাকতেই আমরা ক্যাম্পে পোঁছে গোলাম। বিকেলে কেউ বা বালিয়াড়িতে কেউ বা আশেপাশের গ্রামের দিকে ঘুরে এলাম। ট্রেকিং-এ এটাই শেষ ক্যাম্প, পাশের হাইরোড আর টেন্ট-হোটেলগুলো শহরের আভাস দিচ্ছিল। অভিজিৎদা টেন্টে বসেই ক্যাম্পের ছবি এঁকে ফেলল। রাতের ডিনারে পেলাম কের-সাংরি শাক, যা একান্তই রাজস্থানী খাবার। এই শুকনো মরুভূমিতে খাবারের খুবই অভাব, তাই কাঁটাঝোপ থেকেই এরা বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করে নেয়। এত কম খরচে ঘোরার কথা শুনে বন্ধু সৌমিক খাবার নিয়ে সন্দেহ করে বলেছিল – "দেখবে খাওয়ার সময় লেখা থাকবে কাঁটা বেছে খানা আর তারপর ক্যাকটাসের চচ্চড়ি পাতে দেবে"! কিন্তু প্রতিটা রাজস্থানী রায়া আমরা যথেষ্ট তুঞ্জি করেই খেয়েছি। এদিনই ট্রেকিং-এর শেষরাত, তাই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেও আমরা অন্ধকারে, বিনা আগুনে 'ক্যাম্প ফারার' করব বলে ঠিক করলাম। কেউ তামিল কবিতা, কেউ কর্মড় গান, কেউ কমেডি শুনিরে, কেউ বা সাম্প্রতিক হিন্দি গানের তালে নাচ করে আসর জমিয়ে দিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সুর একসুরে মিলিয়ে "বন্দেমাতরম্" গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ হল।

৩ জানুয়ারি ২০১৫

বেশ কিছু বড় গাছ থাকায় বর্ণার সূর্য ওঠা কিছুটা আড়ালেই রয়ে গেল। একটু পরেই জয়সলমীরের বেস ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাস এসে পড়বে তাই সকালের ব্রেকফাস্ট সেরেই রুকস্যাক গুছিয়ে নিতে হল। হিমালয়ে ট্রেকিং এর তুলনায় এই ট্রেকিং অনেক সহজ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও হয়তো পাহাড়ি পথের তুলনায় কিছুটা কম। বাঙালি ট্রেকিং টিমের নিয়মশৃঙ্খলা এখানে অনুপস্থিত। আগুন না জালানোর সীমাবদ্ধতা ও ভাষার প্রতিবন্ধকতায় ক্যাম্প ফায়ারও অনেক সময় স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে ওঠে না। কিন্তু মরুভূমির ঘন ঘন রূপ পরিবর্তন, রাজস্থানী সংষ্কৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখা আর ভারতের বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে পরিচয়ের অবকাশ এই ডেজার্ট ট্রেক না করা হলে ট্রেকিং-এর একটি স্বাদ যেন অপূর্ণই থেকে যায়।



~ <u>ডেজার্ট ট্রেকের আরও ছবি</u> ~



আমাদের ছুটি আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকার সহ-সম্পাদক সুদীপ্ত দন্ত খুবই বহির্মুখী প্রকৃতির, কাজের ফাঁকে ছুটি পেলেই বেড়িয়ে পড়েন নিরালার খোঁজে। নতুন জায়গার সাথে মিশে আপন করে নেন সেখানকার জীবন, সংস্কৃতি আর খাদ্যাভ্যাস। আর তারপর? পাঠকের কাছে সেই অভিজ্ঞতা সাধ্যমত তুলে ধরার চেষ্টা করন তাঁর অনভিজ্ঞ ভাষায়!

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

E Like Be the first of your friends to like this.



আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্থাগত জানাই = আপনার বেডানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

মদমহেশ্বরের মায়ায়

সুমন্ত মিশ্র

~ মদমহেশ্বরের তথ্য ~ মদমহেশ্বরের ট্রেকরুট ম্যাপ ~ মদমহেশ্বরের আরও ছবি ~

বিকেল পাঁচটায় রঁসিতে যখন বাস থেকে নামলাম তখনও বেশ আলো আছে, এখান থেকে গৌন্দার ছ' কিমি, – পুরোটাই শুনেছি উৎরাই, মনেমনে হিসেব কষে দেখলাম এক ঘন্টার পথ, – তাই দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট না করে হাঁটা লাগালাম। মিনিট পনেরো হাঁটতেই পাহাড়ের বাঁকে রঁসি হারিয়ে গেল, পথ এবার গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, বাস থেকে নেমে যে তু'জন সহযাত্রী আমার সঙ্গে পা বাড়িয়েছিলেন তাঁরাও বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছেন, এখন এই জঙ্গুলে পাহাড়ি পথে একা একা পথচলা।

মদমহেশ্বর গঙ্গার বহমান আওয়াজের সঙ্গেই মিশে যাচ্ছে ঝিঁঝিঁদের একটানা কোরাস, - যেন মোহনবাগান গ্যালারি জুড়ে সব দর্শক একসঙ্গে গোলের বাঁশি বাজাচ্ছে। মাঝেমাঝেই তার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে পাখিদের নীড়ে ফেরার শিস। – শব্দের মরীচিকার মত কানে আসছে টুং টাং শব্দ। বিশ্বাস করতে ভাল লাগছে আমি একা নই, রাস্তায় অনেকে আছে! একটানা নীচে নামতে নামতেই বার কয়েক চড়াই ভাঙ্গা, হাঁপ ধরলেও ভালো লাগে, একঘেয়েমি থেকে মুক্তি। অন্ধকার নামল, পথ চলছিই। সবচেয়ে বাজে হল কোনো আন্দাজই পাচ্ছি না কতদুর এলাম বা আর কতটা যেতে হবে। এমনি করেই এক চডাই-এর মাথায় উঠে মিলল এক দেবস্থান, ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলাম ওটা একটা শাশান। বুকে বল পেলাম, শাশান মানে কাছাকাছি লোকালয় থাকার ইঙ্গিত। আরও মিনিট দশেক চলে এক বাঁকের মুখেই দেখা মিলল, - গৌন্দার গ্রাম। মোবাইলে সময় দেখলাম ছটা-দশ।

গ্রামে ঢোকার মুখেই বাঁদিকে একটা দোতলা বাড়ি, ঠিক তার মুখোমুখি রাস্তার ডানদিকে একটা ছোট্ট ঘর, ঠাসাঠাসি ভিড়, ভিতরে উনুনে কাঠের গনগনে আঁচ, বুঝতে অসুবিধা হয়না বাঁদিকের বাড়ির এটাই কিচেন-কাম-ডাইনিং রুম । ভিতর থেকে আমাকে উদ্দেশ্য করে আওয়াজ ভেসে এল, 'আও দাদা চায় পিও'! ভীড়ে বরাবরই আমার অ্যালার্জি, তাই উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলাম । ক'পা এগিয়েই আরও একটি অমন রান্নাঘর, এরও ভিতরে একইরকম ভিড়। থমকে দাঁড়ালাম, অন্ধকারে রাস্তায় কোনো বয়স্ক মহিলা এগিয়ে আসছেন মনে হল! কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'ইঁহা কৈ রেহেনে খানে কী জা'গা মিলেগা মা'জি' ? - হাঁ হাঁ কিঁউ নেহি, বলে ওই মহিলা সামনের রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে নিজের ভাষায় কিছু বলতেই ভিতর থেকে



প্রায় দৌড়ে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন, 'রেহেনা হ্যায়' - আমার দিকে তাকিয়ে বলতেই ঘাড় নাড়লাম। পেরিয়ে আসা বাড়িটি দেখিয়ে বললেন, 'উঁহা নেহি মিলা'। একটু বিরক্তি নিয়েই জিজেস করলাম -'রেহেনেকি জা'গা স্রেফ উধারই হ্যায় ক্যায়া?' মহিলা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'হামারি ইধার আজ ভিড হ্যায়', বলতে বলতেই রাগ্নাঘরের পাশেই একটি বন্ধ দরজা ধাক্কা দিয়ে খুললেন, ভিতরে টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'দেখিয়ে তো, ইয়ে চ্যালেগা?' টর্চের আলোয় যা দেখলাম – মাঝারি মাপের ঘরটিতে পুরোটাই তক্তাপোষ পাতা, দেওয়াল জুড়ে জামাকাপড় ঝোলান, না চলার মতো কিছু নেই, কিন্তু এতবড় ঘরে শুধু আমাকেই থাকতে দেবে, নাকি আরও অন্য কেউ থাকবে! আশঙ্কাটা ব্যক্ত করতেই মহিলা বললেন, 'নেহি নেহি স্রেফ আপ-ই রেহেনা।' থাকার সম্মতিসূচক ঘাড নাডতেই দিদি দৌডে চলে গেলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন চাদর আর কম্বল নিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'আপ কাপডা চেঞ্জ কর লো, ম্যায় চা'য় লাতি হুঁ।'

ঘামে ভেজা জামাকাপড বদলে উঠতেই দরজায় টোকা. 'সাব চা-য়।' দরজা খুলতেই দেখি এক হাতে জলের জগ আর অন্য হাতে চায়ের গেলাস হাতে দিদি দাঁড়িয়ে। বললেন – 'পহেলে থোড়া পানি পি লো, উসকে বাদ চায় পিনা!' যথা আজ্ঞা। হাত বাড়িয়ে দুটোই নিয়ে হুকুম পালন। চায়ের গেলাসে শেষ চুমুক দিতে না দিতেই আবার হাজির – 'সাব্ থোড়া বাহার কুর্সিমে বইঠো, বিস্তর লাগা দেতি হুঁ। আমি বাইরে বেরিয়ে মোবাইলে মনোযোগ দিলাম, বাডিতে একটা খবর দিয়ে দিই, কাল 'টাওয়ার' পাব কী না পাব। অনেক কষ্টে দিদিকে ফোনে পেয়ে বলে দিলাম মাকে খবরটা দিয়ে দিতে। নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে দেখি মোমবাতি জুলছে, মোমের আলোয় নরম বিছানার আশ্রয় সারাদিনের তুর্ভোগ ভুলিয়ে দিল। আগামীকাল ওপরে যাওয়া, তাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র স্যাক থেকে বার করে একটা ছোট ন্যাপস্যাকে গুছিয়ে নিলাম, বড় স্যাক এখানে রেখেই উঠব।

দরজার বাইরে লোকজনের যাতায়াতের আওয়াজ, হঠাৎ বাংলা কণ্ঠ, 'আজ খুব পরিশ্রম হয়ে গেল, কাল সকালে এই জায়গাটার ভালো করে ছবি নিতে হবে বুঝলি!' অন্য কণ্ঠে সম্মতি! শুনে ভালো লাগল, আমার দেশোয়ালিও কেউ কেউ আছেন এখানে! চমকে দিয়ে দরজা খুলে দেখি এক সুন্দরী কিশোরী, 'আপকো উও কিচেন মে বুলা রহি হ্যায়!' পরিস্কার বাংলায় উত্তর দিলাম 'চলো যাচ্ছি', কী বুঝল জানিনা, তবে চলে গেল! রাত্রি ন'টার মধ্যেই খাওয়া সেরে ওয়ে পড়লাম। সকাল সাতটায় 'জয় মদমহেশ্বর' বলে রওনা! ১২ কিলোমিটার রাস্তা, যত চড়াই-ই হোক

আশাকরি পাঁচ ঘন্টায় পৌঁছে যাব! আসলে বেশীরভাগ রাস্তাটাইতো ১০,০০০ ফুটের নীচে, তাই কষ্ট তেমন হওয়ার কথা নয়, মনে মনে এসব হিসেবনিকেশ করতে করতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি!



মোবাইলের অ্যালার্মের আওয়াজে ঘুম ভাঙল, সাড়ে পাঁচটা। বাঁদরটুপি মাথায় গলিয়ে, ব্রাশ নিয়ে বাইরে এলাম, পাহাড়ের নিত্য অভ্যাস, সকালে উঠেই আকাশের দিকে চাওয়া, সেখানে এখনও তারাদের ঝকঝকে উপস্থিতি! আশৃস্ত হলাম, সকালের পথটুকু অন্তত সূর্যকে সঙ্গী পাওয়া যাবে! প্রাতঃকৃত্য সেরে ঘরে ঢোকার মুখেই দিদির গলার আওয়াজ পাই, 'চায়ে লাউঁ দাদা?' 'হ্যাঁ', বলেই ঘরে ঢুকে টুকিটাকি জিনিসপত্র মিলিয়ে নিই, তৈরি হয়ে নিই দ্রুত। চা খেয়ে ডি-৯০ হাতে বাইরে বেরোলাম, কাল যখন আসি তখন গাঢ় অন্ধকার, সকালের স্লিঞ্চ আলোয় সেই গৌন্দার-ই আজ নানা রঙে রঙিন। দিদির রান্নাঘরে ভিড. সেখানে এখন 'সাহেব'দের 'ব্রেকফাস্ট'-এর প্রস্তুতি, আমিও অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, রুটি এবং ডাল। পায়চারি করতে

করতেই আলাপ হল বাঙালি ভদ্রলোকদের সঙ্গে, ওঁরা কাল মদমহেশ্বর থেকে ফিরেছেন, আজ ফিরবেন উখিমঠ। কিছুটা যেচেই আলাপ জমিয়ে জিজেস করলাম, ভাই ওপরের রাস্তা কেমন! উত্তর পেলাম, 'এতটা এসেছেন, যেমন দেখেছেন তেমনই'! বললাম, 'আন্দাজ কতক্ষণ লাগতে পারে' ? - 'সেটা কি করে বলব, যেমন চলবেন তেমনই'! কিছুটা অপ্রস্তুত হয়েই বলি, - 'সেটা ঠিক, তবে আপনাদের কতক্ষণ লেগেছিল?' বললেন, 'আরে আমরা খুব আস্তে হেঁটেছি', বললাম - 'তাও', - 'দেখুন আমরা সকাল আটটায় বেরিয়েছিলাম, পৌছেছি বিকেল পাঁচটায়', - আমার মুখ দিয়ে অজান্তেই 'এ্যাঁ' বেরিয়ে যায়! দলের যিনি হোতা তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি ক'টায় বেরোবেন?' 'সাতটা - সাড়ে সাতটা ভেবেছি', বলতেই বললেন, - 'সাড়ে তিনটে - চারটের আগে পৌছতে পারবেন না, মনে রাখবেন আমরা কিন্তু 'আপার বানতোলি' থেকে হাঁটা শুরু করেছিলাম!' আমি দূরের গ্রামের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম - 'ওই তো বানতোলি!' বললেন, -'আরে ওখান থেকে আপার বানতোলি আরও চল্লিশ মিনিটের পথ!' - সব কেমন গুলিয়ে যেতে থাকল, সাতপাঁচ না ভেবে ওদের কাছে বিদায় নিয়ে সোজা রান্নাঘর - গরম গরম ডাল-কৃটি খেয়ে, দিদির জিম্বায় স্যাক রেখে পা বাডালাম - 'জয় মদমহেশ্বর'। ঘডিতে সাডে সাতটা।

মদমহেশ্বর গঙ্গাকে ডানদিকে রেখে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পাথুরে পথ, বানতোলি পর্যন্ত উৎরাই। নদীর ওপারের পাহাড়গুলো বেশ লম্বা-চওড়া হওয়ায় রোদের নাগাল পেতে যে এখনও কিছুটা দেরি – বুঝতে পারি। মিনিট কুড়ি যেতেই ছোট একটা ব্রিজ পেরিয়ে বানতোলি, তুই নদীর মিলনস্থল – সরস্বতী ও সুমেরু গঙ্গা, এই মিলিত ধারাই মদমহেশ্বর গঙ্গা, এখানে চার-পাঁচটি বসতি, প্রত্যেকের ঘরেই দোকান। তাদের চা-পানের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেই এগিয়ে গেলাম। এখান থেকে রাস্তা পুরোটাই খাড়াই। পাহাড়ি রাস্তায় ধীরপায়ে পাক খেতে খেতেই আরও মিনিট পনেরো পর উঠে এলাম আপার বানতোলি! সকালে আলাপ হওয়া বাঙালি ভাইদের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল জাংরি এবং হেমকুণ্ড সাহেবের পথে এরকমই কিছু বাঙালি পর্যটকের কথা! অন্যকে বিভ্রান্ত করাতেই যাদের পথ চলার আনন্দ!

পথ নিরিবিলি, বড় বড় গাছের ছায়ায় যেরা পাহাড়ি রাস্তা ধরে চলেছি প্রকৃতির নির্জন অন্তঃপুরে! একজন-তুজন আমাকে টপকে এগিয়ে যান, এঁরা সবাই ওই বিদেশি দলটির সদস্য। এক পা এক পা করে এগোনো, হঠাৎ মাথার ওপর থেকে ভেসে আসে – "দাদা আপ মস্ত চলতে হো"! থমকে ওপর দিকে তাকাই – দেখি হাসিহাসি মুখে জর্জিয়ান দলের পোর্টার ছেলেটি পাকদন্তি পথের ওপরে দাঁড়িয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছে! বলি, ভাইয়া বিশ সালসে ম্যায় অ্যায়সা হি চলতে হ্যায়, কিঁউ, সহি নেহি হ্যায় ক্যায়া?' পূরণ'(পরে জেনেছিলাম ওর নাম) বলল, -নেহি স্যার, ম্যয় নীচেসে আপকো ফলো কর রাহা হুঁ, সাচমুচ আপ বহুৎ আছে চলতে হ্যায়।' মনে বল পেলাম, মাত্র ত্বছর হল আ্যকসিডেন্টে পাকাঁধ ভেঙে সেরে উঠেছি, তাও এবার এসেছি একেবারে একা – পূরণের কথায় আত্মবিশ্বাস বাড়ল সন্দেহ নেই!

এক ঘন্টার আগেই 'খাদাডা' পৌঁছলাম। দু'ঘর মানুষের গ্রাম এই খাদাডা। পাহাডি পথে পানীয়ই শক্তি - চায়ের ফরমায়েশ করে চেয়ে রইলাম তুষারমৌলি হিমালয়ের দিকে৷ স্পর্শ পেলাম প্রথম সূর্য কিরণের, পরিচয় হল পুরণের দলের গাইড কুন্দনের সঙ্গেও! মিনিট পাঁচেকের বিশ্রাম, আবার পথচলা, শ্যামলী পাহাড়ের মাথায় নীল আকাশের ঘোমটা, সকালের নরম রোদ্ধরে রূপ যেন ফেটে পডছে। গলায় ঝোলানো ক্যামেরায় হাত পড়ে! পর পর বেশ কিছু ছবি নিই, আবার চড়াই ভাঙা! এখানে জঙ্গল কিছুটা পাতলা, রোদ-ছায়া মেশানো পথে পাখিদের হরেক রকম ডাক শুনতে শুনতে এগিয়ে চলা। মাঝেমাঝে পাথর ভাঙার শব্দ, জায়গায় জায়গায় রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে, একে একে পেরিয়ে আসি নানু, মৌখম, কুন - ঘড়িতে সাড়ে



এগারটা! ঘন জঙ্গলে ঢাকা পথে নতুন মূর্তিমান উৎপাত শ্রীনগরের(গাড়োয়াল) ছাত্রছাত্রীদের একটি দল। লাউডম্পিকারে গান বাজিয়ে, নেচে, হল্লা করে শিবভূমির শান্তি মাথায় উঠিয়েছে। বিরক্ত হয়েই চলার গতি বাড়াই।

বেলা পৌনে বারটা নাগাদ উঠে আসি শিবঠাকুরের আপন দেশে – মদমহেশ্বর উপত্যকায়।

'ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি - চারদিকে নিরুচ্চারে যেন এই বাণীই ধ্বনিত হচ্ছে, - অপূর্ব, মন ভরে গেল -'পূণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর!' রাস্তার বাঁদিকে বোর্ডে উচ্চতা লেখা ৩২৮৯ মিটার! বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকা, মাথার ওপর পরিস্কার নীল আকাশ, ডানদিকে তুষার শোভিত হিমালয়, বাঁ প্রান্তে 'বুড়া'র খাড়া দেওয়াল আর সামনে দেবাদিদেবের গর্ভগৃহ। পৌছে গেছি পঞ্চকেদারের এক কেদার, মদমহেশ্বর! মিনিট পাঁচ চলতেই পর পর গুটি-কয়েক থাকবার চটি! বাঁদিকের রাস্তার ঢালে প্রথম চটিতেই কুন্দন চেয়ার পেতে বসে, আমাকে দেখেই বলে - 'ক্যায়া দাদা বোলেথে না, আপ বারা বাজে কি পহেলেহি পৌছ যায়েকে!' - ঘড়ি দেখি - বারটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। পাথর কাটা থাপে নেমে এসে বসি কুন্দনের পাশে। হোটেলের মালিক প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাতজাড় করে এগিয়ে আসেন, বলেন, 'দাদা আপকে বারে মে ইয়েলোগ (কুন্দন কে দেখিয়ে) বোলা, মেরে পাস দো ক্রম হায়, -পহেলে ফোরেনার লোগোকো চয়েস করনে দিজিয়ে, উসকে বাদ আপকো কামরা দেকে, আপ আরাম সে ধুপমে বৈঠো!' প্রকৃতির উদারতা মনের ওপর ছাপ ফেলল কিনা জানিনা, বললাম - 'মেরেকো রাতকো শোনে কে লিয়ে থোড়াসা জা'গা দে দেনা, উসসেই চলেগা।'



শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে, ঘামে ভেজা জামাকাপড় পাল্টিয়ে রোদে বসি কুন্দনের পাশে। রান্নাঘরের সামনেই এক প্রৌঢ়া আটা মাখায় ব্যস্ত, - আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলি, - 'দিদি আজ বড়িয়া খানা বানানা, আপকি হাতকি বানায়ি হুয়ি রোটি বহুৎ দিন ইয়াদ আনা চাহিয়ে!' দিদি ঈষৎ হেসে ঘাড় হেলান! - কিন্তু আমার এই কথা ক'টায় যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধুন্ধুমার বাধতে পারে তা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি! বেশ কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর শিবানন্দজি (হোটেল মালিক, পুরোনাম -শিবানন্দ পানওয়ার) আমার কাছে এসে বলেন, 'এক বাত হ্যায় দাদা, আপ ইধার রেহেঙ্গে, লেকিন খানা খানে হোঙ্গে মন্দির কি পাস যো হোটেল হ্যায় উসমে।' কুন্দনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ইয়ে লোগোকো ভি উধার-ই খানা

পড়েগা, ম্যায় স্রেফ ফোরেনার লোগোকো খানা খিলায়েঙ্গে! এতক্ষণে মালুম হয় বচসার কারণ! আমাদের অপরাধ জানতে চাই! বলেন, 'ক্যায়া বাতায়ুঁ দাদা, ইঁহা 'ইউনিয়ন' হ্যায়, মন্দির কমিটি বালে নে ইয়ে ঠিক করতে হ্যায়, – কৌন কাঁহা খানা খায়েঙ্গে!' শুনে হাড় হিম করা শীতেও মাথা গরম হয়, বলি – 'আমি এখানেই খাব, তারপর ইউনিয়ন কিছু বললে আপনি আমায় বলবেন!' বেচারি নেহাতই ভালো মানুষ, ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়, আমায় বারবার বোঝাতে থাকেন নিজের অসহায়তার কথা! ওনাকে বলি, – 'এই 'ইউনিয়ন' যে মানুষের কত বড় সর্বনাশ করতে পারে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ আমাদের বাঙালি জাতি! যেখানে শিক্ষার সমবন্টন নেই সেখানে 'ইউনিয়ন' শব্দটা যে শুধুমাত্র ক্ষমতাবান কিছু লোকের স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকে, বাকি সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় – এটা আমাদের চেয়ে ভালো কেউ জানেনা!' শিবানন্দজি আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করেও নিজের অসহায়তা ব্যক্ত করেন। অগত্যা সেরকমই ঠিক হয়।

তুপুরের পর থেকে চারিদিক মেঘে ঢেকে গেল। বুড়ামদমহেশ্বর দর্শন আগামীকালের জন্য তোলা রেখে তুপুরের আড্ডা জমলো 'আশুতোষ ট্যুরিস্ট হোটেলে'-এর রান্নাঘরে! কথায় কথায় কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে, কে বলবে আমাদের আলাপ মাত্র কয়েক ঘন্টার! মন্দিরে ছ'টার ঘন্টা বাজতেই পুজোর ডালা নিয়ে পৌঁছে গেলাম সন্ধ্যারতি দর্শণে! অবাক হলাম জর্জিয়ান দলটির নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখে, সারিবদ্ধ ভাবে হাতজোড় করে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত! লজ্জাবোধ হল আমার দেশেরই কিছু লোকের জন্য, যাঁরা অকারণে এঁদের সাথে দুর্ব্যবহারে উদ্যত হলেন। প্রতিবাদ করলাম. প্রধান পুরোহিতের হস্তক্ষেপে সমস্যা মিটল। এক ঘন্টার আরতি যতই 'স্তবের বাণীর আডাল'-এ থাক, ভক্তের সরল প্রাণে নিরব হয়ে ডাকায় তাতে ছেদ পডল না এতটুকু।



পুজো সেরে, রাতের খাবার খেয়ে রাত আটটাতেই স্লিপিং ব্যাগে ঢুকলাম।

পাঁচটায় অ্যালার্ম বাজলো, উইভচিটার-টুপি গলিয়ে বাইরে এলাম, কনকনে ঠাণ্ডা, সারাটা উপত্যকা যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে তারাদের উজ্জ্বল পাহারায়! আমি প্রস্তুত হই, প্রস্তুতি বুড়ামদমহেশ্বর দর্শণের! ঠিক ছ'টায় মন্দিরের পিছনের রাস্তা ধরে উঠতে আরম্ভ করলাম, আধঘণ্টা উঠতেই নজরে এল কাঙ্খিত 'টৌখাস্বার! – 'একি এ সুন্দর শোভা' – চৌখাস্বার মাথায় প্রথম সূর্যকিরণের চুস্বন! দ্বিগুন উৎসাহে বাকি পথটুকু শেষ হতে লাগল আরও আধঘণ্টা। উচ্চতা ১১,৪৭৩ ফুট – সব পরিশ্রম যেন উবে গেল! সর্বাঙ্গ আনন্দে মাখামাখি হয়ে হোটেলে যখন ফিরলাম, ঘড়িতে সকাল সোয়া আটটা। নেমে যাব আজই – গৌন্দার। জলখাবার খেয়ে সবকিছু গুছিয়ে শিবানন্দজির কাছে গোলাম পাওনাগভা মেটাতে! অবাক কাণ্ড! বারবার বলেন, –'আপসে কুছ নেহি লে পায়েঙ্গে দাদা, কুছ নেহি দেনা, ফির্ আনা!' – জলেভরা চোখ, রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ানো দিদির তু'গালেও জলের ধারা, – আমারও কি দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে! না আর দেরি করব না, মনেমনে একটা হিসেব করে টাকাণ্ডলো গুঁজে দিলাম শিবানন্দজির পকেটে, তু'হাতে জড়িয়ে নিলেন বুকে! অস্ফুটে কিছু কথা, পৌছলোই না কানে! স্যাক পিঠে হাঁটা দিলাম।

হিমালয়ের পথে পথে এই ভালোবাসাই পথ চলিয়েছে বারবার, ফিরতে ফিরতে শুরু একটাই প্রশ্ন আসে মনে, লোকে যে বলে জন্ম জন্মান্তরের ভালোবাসা – এটা তবে কি। মাত্র একবেলার অতিথিকেও এই মায়াবন্ধনে জডানোর ক্ষমতা যে শুধু হিমালয়েরই আছে।



~ <u>মদমহেশ্বরের তথ্য</u> ~<u>মদমহেশ্বরের ট্রেকরুট ম্যাপ</u> ~ <u>মদমহেশ্বরের আরও ছবি</u> ~

কোলকাতায় আনন্দমোহন কলেজ থেকে অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স নিয়ে পাশ করে, দি ইনস্টিটিউট অফ চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস্ থেকে কম্পিউটার সার্টিফিকেট কোর্স করেন সুমন্ত মিশ্র। মাঝে কিছুদিন দিল্লিতে একটা চাটার্ড ফার্মে কাজ করে বর্তমান ঠিকানা দুর্গাপুরে ফিরে আসেন। এখন সেলফ্ এমপ্রয়েড, - "হরফা নামে একটি প্রিপ্রেস ইউনিট চালান। হিমালয়ের আতিথ্য গ্রহণ ও ফুটবল খেলার দৃষ্টিসুখ তাঁকে অসীম তৃপ্তি দেয়। ভালোবাসেন রবি ঠাকুরের গান শুনতে, প্রবন্ধ পড়তে, ছোটগাছকে বড় করতে, বেড়াতে আর নানারকমের মানুষের সাহচর্য পেতে। ইন্টারনেটের তুনিয়ায় 'আমাদের ছুটি' কিছু সমমনস্ক মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়ায় আনন্দিত হয়েছেন!



কেমন লাগল : - select -মত দিয়েছেল :

গড: 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend 🚮 🖢 🖂 ...

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.



। পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

ভারতের উত্তরতম প্রান্তভূমিতে

জামাল ভড

~ লাদাখের তথ্য ~ লাদাখের আরও ছবি ~

পৃথিবীর দ্বিতীয় শীতলতম জনবসতিপূর্ণ স্থান দ্রাস ও কার্গিল দেখার লোভে আমরা শ্রীনগর থেকে ১-ডি জাতীয় সড়ক ধরে লেহ-র উদ্দেশে রওনা দিলাম সকাল ঠিক আটটায়। তুপুরের দিকে দ্রাস পৌঁছালাম। বাল্টিক উপভাষায় দ্রাস কথার অর্থ নরক। ১০,৯৯০ ফুট উচ্চতার দ্রাসে পৌঁছেই শীতের অনুভূতি প্রবলভাবে কাঁপিয়ে দিল। মোবাইলের অ্যাপে তাপমাত্রা দেখলাম ৬ ডিগ্রি, মে মাসের ৩১ তারিখেই - কলকাতা ও দিল্লিতে যখন গরমের ঠেলায় ত্রাহি ত্রাহি রব! দ্রাস ক্ষুদ্র জনপদ। ঠোঁটে ছাাঁকা লাগা গরম কফি চুমুক দিয়ে শেষ করতে না করতেই দেখি ঠাণ্ডা!

ঘন্টা তুই পর ষাট কিমি দূরে কার্গিল পৌঁছে দেখি ঘড়িতে তখন বেলা আড়াইটে। এই সেই কার্গিল, ১৯৯৯ তে খবরের শিরোনামে ছিল। রাতারাতি কার্গিল জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী সীমানা পেরিয়ে বেশ কিছু অঞ্চল জবরদখল করে। ভারতীয় সেনারা প্রাণ বাজি রেখে তাদের কাছ থেকে হাত এলাকা পুনরুদ্ধার করেছিল বেশ কিছু শহিদের বিনিময়ে। সুরু (সিন্ধুর স্থানীয় নাম) নদীর তীরে কার্গিল। ৮৭৮০ ফুট উচু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে। পনের হাজারের মতো জনসংখ্যার এই কার্গিল। শুনলাম নব্বই শতাংশ শিয়া মুসলিম, পাঁচ শতাংশ সুন্নি ও বাকিরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বামদিকে পাহাড়ের ঢালে বড় বড় হরফে ইংরাজিতে টোলোলিং লেখা দেখিয়ে ড্রাইভার কাশেম বলল, এখান দিয়েই পাকিস্তানি সেনারা প্রথম অনুপ্রবেশ করেছিল। কার্গিল ওয়ার মেমোরিয়াল দেখে জুম্মা মসজিদে দ্বিপ্রাহরিক নামাজ পড়ে হোটেল রিয়াজে মধ্যাহ্নভোজন সেরে আবার রওনা।

শ্রীনগর থেকে লেহ-তে সড়কপথে যাওয়ার সময়ই পেরোতে হল জোজি লা (১১৫৭৫ ফুট), নামিকা লা (১২৬০০ ফুট) ও ফতু লা (১৩৪৭১ ফুট)। এই পথেই ভারতে বহিঃআক্রমণ হয়েছে অতীতে, এই পথেই তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য চলত বহু আগে -- আজ সেই পথ , সেই সমস্ত "পাস" পাস করার আনন্দের আতিশয্যে একমিনিটের তরেও ক্লান্তি স্পর্শ করছিল না দীর্ঘ ৪৩৪ কিমি পথ অতিক্রমের যাত্রা সত্ত্বেও।

সন্ধে নটার দিকে (এখানে সন্ধে নামে আটটায়) কাশেম এক জায়গায় গাড়ি থামাল। সাইনবোর্ডে দেখলাম -- খালৎসি। সে বলল, এখানে নৈশভোজ সেরে নিতে হবে। খালৎসিতে বিদ্যুৎ নেই -- সন্ধে থেকে রাত দশটা অবধি জেনারেটরের আলো। তারপরে আঁধার নেমে আসে। হোটেল ম্যানেজারের মুখে শুনলাম এক নেপালি ভদ্রলোক এই হোটেলের লিজ নিয়েছেন। মে মাসের পনেরো তারিখে হোটেল চালু হয়েছে -- চলবে অক্টোবরের শেষ অবধি। তারপর পাততাতি শুটিয়ে আবার নেপাল। ২০০৮ থেকেই নাকি এখানে বিদ্যুৎ আসবে-আসবে করছে, এখনও এসে পৌঁছায়নি।

লেহ-তে প্রবেশের একটু আগে ড্রাইভার এক জায়গায় গাড়ি ধীর গতিতে এনে বলল -- এটা ম্যাগনেটিক হিল । পাহাড়ের নীচে চৌম্বকশক্তি গাড়িকে স্থানচ্যুত করে। সাইনবোর্ডেও দেখি সেই কথাই লেখা আছে।

রাত একটায় লেহ-তে পৌঁছালাম। লেহ তখন নিশীথের সুপ্তিতে মগ্ন। হোটেল খায়ুলের সুখপ্রদ বিছানায় শুয়েও সারাদিনের ভ্রমণজনিত ক্লান্তিও তুচোখের পাতাকে এক করতে পারছিল না। এ যেন পিয়া-মিলন-বাসনার প্রতীক্ষা। কখন মিলিত হব আমার স্বপ্নচর লেহ-র সঙ্গে। কখন তুচোখ ভরে দেখব আমার বহু প্রতীক্ষিত লেহ, প্যাংগং, খারতুং লা, চাঙ লা, ডিসকিট, হুভার, নুব্রা -- এরা প্রত্যেকে যেন আমার পরিবারের সদস্য।



১৯৭৯ তে লাদাখ জেলাকে ভেঙে দু'টি জেলা -কার্গিল ও এই লেহ জেলা তৈরি হয়। লেহ জেলার সদর লেহ শহর। গুজরাতের কচ্ছ জেলার পর এটাই ভারতের দিতীয় বৃহত্তম জেলা - ৪৫,১১০ বর্গ কিমি। ১১,৫৬২ ফুট উচ্চতার লেহ শহরে আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পরদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম। হোটেল আর আশেপাশে একটু পায়চারি। হোটেল খায়ুলের অবস্থান ওল্ড ফোর্ট রোডে। হোটেল মালিক জি.এম. মীর স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কৃষিবিজ্ঞানী, চাকরিতে তু'জনেই উচ্চপদে আসীন। একমাত্র মেয়ে ফুটফুটে লাদাখি পুতুল -- সিয়ানা। সারাদিন সিয়ানাকে নিয়ে খেললাম। সিয়ানা যেন কাবুলিওয়ালা গল্পের মিনি -- অনর্গল কথা বলে। এখনও চোখ বন্ধ করলে সিয়ানার মিষ্টিমুখ, সুশ্রী চেহারা, লাদাখের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। লেহ থেকে পরদিন বেরলাম আমার স্বপ্নমানসী প্যাংগং লেককে দেখার আশায়। দূরত্ব ১৩৪ কিমি। পথে পড়ল শ্যে। এখানেই থ্রি ইডিয়টস খ্যাত স্কুলটি অবস্থিত। ফেরার পথে দেখব ঠিক করলাম। প্যাংগং-এর

অনির্বচণীয় আকর্ষণ আমাকে অনবরত তাড়া করছিল তখন। কখন তুচোখ ভরে দেখব অপ্সরাসুন্দরী প্যাংগং-কে। ১৪,২৭০ফুট উচ্চতায় ১৩০ কিমি দীর্ঘণ্ড প্র সর্বাধিক ৫কিমি প্রশস্ত এই প্যাংগং সো (Tso)। 'সো' কথার অর্থ সরোবর, যেমন 'লা' মানে গিরিপথ। লেকের লবণাম্বুরাশির লাবণ্যর তুর্নিবার আকর্ষণে কিছু দূরের চাং লাতেও বেশি সময় নিলাম না। চাং লা। চাং অর্থাৎ দক্ষিণ আর লা মানে পাস বা গিরিবর্ত্তা। অর্থাৎ দক্ষিণে প্রবেশের গিরিবর্ত্তা। চাং লা পৃথিবীর তৃতীয়* উচ্চতম মোটরগাড়ি চলার পথ। উচ্চতা ১৭,৬৫০ ফুট। চাং লা-তে যখন পৌছাই, দেখি তুষারপাত হচ্ছে। সেনাবাহিনির স্বাস্থ্যসহায়ক কেন্দ্র আছে (আগত পর্যটিকদের হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে দেখভালের জন্য)। আমার স্ত্রী শবনম অর্থাৎ শিশির আর শ্যালিকা নার্গিস যার মানে ফুল, তুষারপাতে নিজেদের অবগাহন করতে লাগল। স্ত্রীর উদ্দেশে বললাম -- শিশিরে তুষারপাত। আর শ্যালিকাকে বললাম -- ফুল শিশিরসিক্ত হতে দেখেছি, তুষারাবৃত হতে এই প্রথম দেখছি।

শেষপর্যন্ত পৌঁছলাম প্যাংগং লেক। এ কী দেখি। দিগন্তবিস্তৃত নীলজলরাশির একটা চওড়া ফিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাতা! এই সুদীর্ঘ একশো তিরিশ কিমি বিস্তৃত লেকের মাত্র চল্লিশ কিমি ভারতের অন্তর্ভুক্ত, বাকিটা চিনের তিব্বতে। নীল ! নীল ! শুধুই নীল -- কোথায়ও ফিকে নীল , কোথায়ও গাঢ় নীল আবার কোথায়ও ময়ুরকন্ঠী নীল -- নীল नीनिभाग्न नीन। नीन এই कार्त्र(गरे. य-जः मित. তা অদেখাই থেকে যাবে। মনে হল সুন্দরীর সম্পূর্ণ অবয়ব না দেখে শুধুমাত্র মুখটুকুই দেখলাম। এতেই এত লাবণ্য, সারা অঙ্গে না জানি কত কান্তি। লেকের ধারে যে রেস্তোঁরাতে আমির খান উঠেছিলেন সেখানে ঢুকে আলাপ হল এক ব্রিটিশ দম্পতি ও তাঁদের সুইডিশ বান্ধবীর সঙ্গে। ২০০৬-এ তারসেম সিং পরিচালিত 'দ্য ফল' ছবির (লি পেস . ক্যাটিনকা আনটার ও জাস্টিন ওয়াডেল অভিনীত) কিছু অংশ এখানে স্যুটিং হওয়ার পরে



ভারতের বাইরের অনেক পর্যটকই লাদাখ আসছেন। তাছাড়া শ্যাম বেনেগালের নেতাজী সুভাষ বসুর উপর নির্মিত 'দ্য ফরগটন্ হিরো' ও বলিউডের অন্যান্য কিছু সিনেমা যেমন 'গজনি , 'তাশান , 'লক , 'পাপ ও সর্বোপরি আমির খানের 'থ্রি ইডিয়টস্ লাদাখকে ভারতীয় পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তলেছে।

প্যাংগং থেকে ফেরার পথে শ্যে-তে সেই একদা অখ্যাত পরে আমির খানের প্রি ইডিয়টস্ ছবির স্যুটিং-এর দৌলতে বিখ্যাত হওয়া স্কুল দেখে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন রাত হয়নি. সন্ধে আটটা।

এর পরের গন্তব্য খারত্বং লা। পৃথিবীর উচ্চতম* মোটরগাড়ি চলাচলের পথ। যাত্রাপথে দেখলাম পথের ওপরে অনেক জায়গাই বরফে ঢাকা -- চাকা যাওয়ার সরু দাগটুকুই দেখা যাচ্ছে। এবারের ড্রাইভার মহম্মদ আলি সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে চালাতে পৌছে গেল। সাইনবোর্ডে ইংরেজিতে জুল্জুল্ করছে খারত্বং লা ১৮,৩৮০* ফুট -- পৃথিবীর সর্বোচ্চ মোটর চলার সড়ক। একটা ক্যাফেরিনাতে লেখা আছে -- পৃথিবীর সর্বোচ্চ ক্যাফেরিনা। এক স্যুভেনিরের দোকানেও ওই একই বিজ্ঞাপন। উঃ! কী তুষারপাত! নিমেষে সর্বাঙ্গ শুভ্রু তুষারকণায় ভরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে রাশি রাশি তুলো টুকরো টুকরো করে ওপর থেকে কেউ ফেলে দিছে।



খারদুং লা থেকে এবার চললাম শীতল মরুভূমি দেখার অভিপ্রায়ে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে রুক্ষ্ম নেড়া পাহাড় দেখতে দেখতে। সায়ক নদীর তীর ধরে কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর মহম্মদ আলি গাড়ি থামিয়ে বলল -- ওই দেখুন মার্মট। মূষিক সদৃশ তৎপর প্রাণী। এরপর মহম্মদ আলি যা দেখাল তা অতি বিরল প্রাণী -- তিব্বতি বুনো গাধা -- কিয়াং। অনেকগুলো কিয়াং ঘুরে বেড়াচ্ছে -- একটু কাছে গেলেই দে ছট।

কখন পৌঁছে গেলাম দিসকিট-এ ৩৫ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট বুদ্ধমূর্তির সামনে। অপূর্ব মূর্তি। অদূরে বৌদ্ধ সন্ধ্যাসীদের জন্য বসবাসের মঠগুলিও লাগোয়া। দিসকিট ছেড়ে চলে আসার পরই চোখে পড়ল বালি আর বালি, রাশি রাশি বালি, ডানদিক বরাবর বিস্তৃত বালি আর বালিয়াড়ি -- কোথাও ঢিবি, কোথাও সমতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীর আকৃতিতে -- মনে হল যেন ঢেউয়ের দোলায় দোলায়িত হচ্ছে বালুকণারাশি। সিয়াচেন হিমবাহের গলিত জল এখানে নুবা নদীতে মিশেছে -- যা তির্তির করে বয়ে

চলেছে সায়ক নদীতে পড়বে বলে। গেলাম মরুভূমিতে। তুংকুঁজ বিশিষ্ট ব্যান্ত্রিয়ান উট দেখলাম, চড়লাম – পনেরো মিনিটে দেড়শ' টাকা।
এরপরে হুভার -- জামসেদজীর হোটেল -- ব্যাক্তির নামেই হোটেলের পরিচিতি। মে-র তিন তারিখেই বেশ ঠাণ্ডা। জামসেদজীর সঙ্গে আলাপ হল।
জায়নামাজ চাইলাম। কেবলা-নির্দেশক কম্পাস-সম্বলিত একটা সুদৃশ্য জায়নামাজ দিলেন। জানলাম হুভার-নুব্রার জীবনযাত্রার কাহিনি। স্থানীয়
বিশেষজ্ঞদের মতে নুব্রা শব্দটি লুমা (Lumra) থেকে এসেছে -- যার অর্থ পুষ্প-উপত্যকা। লাদাখের এই হুভারেই কিছু সবুজের ছোঁয়া পাওয়া যায়
কাঁটাগাছ ছাডাও। তাই এখানে চাষ-আবাদ হয়।

পরদিন হুন্তার ছেড়ে ফিরে চললাম। পথে পড়ল এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি। যেতে যেতে চোখে পড়ল লেখা - সিয়াচেন মাত্র ৮০ কিমি দূরে। পথে একটা লোহার ব্রিজ। ফটো তোলার জন্য ক্যামেরা বের করতেই এক সেনা জওয়ান ছুটে এলেন। নিষেধ করলেন ছবি তুলতে। স্থানীয় এক গ্রামে পৌঁছালাম ঘুরে ঘুরে। গ্রামের শান্ত পরিবেশের মাঝে অতি সুন্দর বৌদ্ধমন্দির। মন্দিরের কারুকার্য চোখে পড়ার মতো। আর কিছুটা এগোলে পানামিক উষ্ণ প্রস্তবণ। কিন্তু ড্রাইভার মহম্মদ আলি রাজি না হওয়ায় ফিরতে হল। সন্ধীর্ণ চড়াই উৎরাই বরফে ঢাকা পথে ফেরা ঝুঁকিপূর্ণ, তার উপর যেভাবে তুষারপাত হচ্ছে! চার তারিখে রাত নাটায় ফিরে আবার হোটেল খায়ুল। পরদিন আবার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। লেহ-কে শেষবারের মতো উপভোগ করতে ইতন্তত বিক্ষিপ্ত ঘোরাঘুরি -- কখনো তিব্বতি মার্কেটে, কখনো স্থানীয় বাজারে -- দেখলাম পথের তুদিকে সবজির পসরা সাজিয়ে বিক্রি হচ্ছে -- বিক্রেতারা বেশির ভাগ মহিলা।

লেহ-তে দর্শনীয় বলতে রাজা সেংগি নামগিয়াল (১৬১২-১৬৪২) প্রতিষ্ঠিত রাজপ্রাসাদ, শান্তিস্তৃপ, হেমিস গুম্ফা, ওয়ার মিউজিয়াম ও জামা মসজিদ --যা লেহ-তে বিশ্রামের দু'দিনেই দেখে নিয়েছি। লেহ-তে দুটি বড় জামে মসজিদ আছে, একটি সুন্নিদের, অপরটি শিয়াদের। তিব্বতীদের দু'টি বাজার আছে, একটি বহু দোকান সম্বলিত, অপরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কী নেই সেই বাজারে, দেশি- বিদেশি বিবিধ জিনিসপত্রের সম্ভার, কোরীয় ব্ল্যাক্ষেট, জাপানী ল্যাপটপ, জার্মান ক্যামেরা, সুইডিস ঘড়ি, ক'টা জিনিসের নাম বলব? হাল ফ্যাশনের পোশাক-আশাক? তাও পাবেন।

বিদায়ের দিন নুব্রা যাত্রার সঙ্গী ড্রাইভার মহম্মদ আলি বলল -- বাবু আমাদের গাঁয়ে চলুন। বললাম, কোথায় তোমার বাডি? সে বলল, জাঁসকর। সেটা কোথায়, আমার জিজ্ঞাসা। জানাল, চাদরের পাশে। বললাম, চাদর? সেটাই বা কোথায়? সে বলল, কার্গিল হয়ে যেতে হয়। জানতে চাইলাম, সেখানে কী কী দেখার আছে? মহম্মদ উৎসাহী হয়ে বিনম্রভাবে



বলল, জাঁসকর নদী যখন বরফে ঢেকে যায়, তাকে বলে চাদর। বরফের বৈচিত্র্য দেখতে হলে জাঁসকর যেতেই হবে, অন্তত বারো রকমের বরফ আছে। আম আপেলের প্রজাতি আছে জানতাম, বরফের বৈচিত্র্যের কথা এই প্রথম শুনলাম। যা হোক কিছু করার নেই, সকাল এগারটায় ফ্লাইট। বললাম, আপাতত আমাদের এয়ারপোর্টে পৌঁছে দাও। আবার যদি কোনদিন লাদাখে আসি তখন সে সাধ পূর্ণ করব।

[*পৃথিবীর উচ্চতম মোটর চলার পথ খারতুং লা নয়, যদিও খারতুং লা-তে সেটাই লেখা আছে। খারতুং লা-র উচ্চতা ১৭৭৭০ ফুট। এটা পৃথিবীর তৃতীয় ও চাং লা চতুর্থ উচ্চতম মোটর চলার পথ। বিশ্বের সর্বোচ্চ মোটর চলার গিরিপথ মারসিমিক লা (১৮৪০০ স্থূট) ও দ্বিতীয় উচ্চতম কাকসাং লা (১৭৮৮০ স্থূট) তুই-ই অবশ্য লাদাখেই। প্যাংগং সো থেকে হানলে বা সরাসরি সো মোরিরি যেতে গেলে পথে কাকসাং লা পেরোতে হয়। আর প্যাংগং থেকে ৩০ কিমি উত্তরের মারসিমিক লা যান খুব কম লোকই। কারণ অতি দুর্গম এই গিরিপথের ওপারে আর কোনও বসতি বা বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নেই। - সম্পাদক]



~ <u>লাদাখের তথ্য</u> ~ <u>লাদাখের আরও ছবি</u>

পেশায় শিক্ষক জামাল ভড়ের শখ দেশবিদেশের মুদ্রা ও নোট সংগ্রহ এবং ভ্রমণ। পাশাপাশি নেশা সাহিত্য চর্চা - বিশেষত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা। বিভিন্ন সময়ে আজকাল, ওভারল্যান্ড, কলম ইত্যাদি পত্রপত্রিকা ও ওয়েব ম্যাগাজিনে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ২০১০-এ সোনাঝুরি ওয়েবম্যাগাজিনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কবি - 'সোনার স্রষ্টা' পুরস্কার লাভ।



কেমন লাগল : - select -

tell a Friend f & M.

মত দিয়েছেল : গড: 0.00



মাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

অমর্নাথ দর্শন

শুভ্রনীল দে

~ অমরনাথের তথ্য || অমরনাথের আরও ছবি || অমরনাথ ট্রেকরুট ম্যাপ ন

"...The Swami was full of the place. He felt that he had never been to anything so beautiful. He sat long silent. Then he said dreamily, "I can well imagine how this Cave was first discovered. A party of shepherds, one summer day, must have lost their flocks, and wandered in here in search of them. Then, when they came home to the valleys, they told how they had suddenly come upon Mahadev!..."

- From "The master as I saw him" by Sister Nivedita

হর পার্বতী হিমালয়ে বসে কথা বলছেন। পার্বতীর ইচ্ছে, অমরত্বের গোপন রহস্য জানার। স্রষ্টার কাছেই সৃষ্টির এই গোপন রহস্য জানতে ধরে বসলেন স্বামী ভোলানাথকে, বলতেই হবে। সংসারের অনেক স্বামীদের মতই মহাদেব স্ত্রীর আবদারের কাছে হার স্বীকার করলেন কিন্তু তার জন্য চাই এমন এক জায়গা যেখানে নিরিবিলিতে বসে সমস্ত প্রাণী জগতের চোখ কান বাঁচিয়ে এই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন।

চলতে চলতে হিমালয়ের এক জায়গায় এসে মহাদেব তাঁর বাহন নন্দীকে ত্যাগ করলেন। পুরাকালের বয়লগাঁও আজকে পহেল গাঁও নামে পরিচিত। আরও কিছু পথ যাবার পর তিনি নাগকেও ত্যাগ করলেন, বর্তমানে যে স্থান শেষনাগ বলে পরিচিত। এভাবে সব কিছু ত্যাগ করতে করতে বর্তমানের পঞ্চতরণী-তে এসে তিনি তাঁর পঞ্চতুকেও বিসর্জন দিলেন; সর্বস্ব ত্যাগ করে তুজনে এসে পৌঁছালেন পর্বত শিখরে ঘেরা লোকচন্দুর আড়ালে একটি গুহামুখের সামনে। গুহার মধ্যে কোনও প্রাণী থাকলেও থাকতে পারে ভেবে ভোলানাথ তাঁর তৃতীয় নয়ন দিয়ে গুহার সব কিছু ছাই করে দিলেন। তারপর একটি পাথর খণ্ডের ওপর বসে পার্বতীকে শোনালেন অমরত্বের গোপন সেই রহস্যকথা। যার সাক্ষী রইলনা কেউ। না, ভুল বললাম। গুহামধ্যের একটি কোণে একখণ্ড পাথরের তলাতে সযত্নে রাখা দুটি ডিমের ভেতর দুটি পায়রা ছানা তখনও বেঁচে ছিল। তারাই একমাত্র জানতে পারল সেই রহস্য।

যে গুহাতে বসে মহাদেব পার্বতীর কাছে এই রহস্য উন্মোচন করেছিলেন বলে গল্পকথা, সেটাই বর্তমানের তুষারতীর্থ অমরনাথ। আর আজও অমরনাথ দর্শনে ওই প্রতিকূল পরিবেশে তুটি পায়রার দর্শনও পাওয়া যায়। এই তুটি পায়রাই অতীতের সেই তুটি কবুতর শাবক কিনা সে নিয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু তীর্থ হিসাবে অমরনাথের প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। আর তার টানেই আজও রাস্তা ভালো না হওয়া সত্ত্বেও বহু তীর্থযাত্রী এই বিপদ সন্ধুল পথে পাড়ি দেন। এই যাত্রা পথে বিপদ যেমন আছে ঠিক তেমনি আছে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পথের কঠিনতা স্লান হয়ে যায় তার কাছে।

১৮৯৮ স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা গিয়েছিলেন অমরনাথ দর্শনে, পথ তুর্গম - অত্যন্ত কষ্ট ; তা সত্ত্বেও পথের সৌন্দর্যে তু'জনেই মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন -

"It was a beautiful little ravine floored, for the most part with sandy islands in the pebble-worn bed of a mountain stream. The slopes about it were dark with pine-trees and over the mountain, at its head, was seen, at sunset, the moon, not yet full. It was the scenery of Switzerland or Norway, at their gentlest and loveliest." (" The Master as I saw him ")

পূৰ্ব ইতিহাস

পুরাণে উল্লেখ না থাকলেও এই তীর্থযাত্রা গুরু নিয়ে তুটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। একটি প্রবাদ বলে, পুরাকালে প্রবল জলোচ্ছাসে যখন সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা জলমগ্ন হয়ে পরে তখন ঋষি কাশ্যপ প্রচুর নদ-নদী সৃষ্টি করে কাশ্মীরকে রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে মহর্ষি ভৃগু হিমালয় পরিক্রমাকালে এই গুহার সন্ধান পান। তিনিই সর্ব সাধারণকে এই গুহার হিদস দেন। অন্য একটি প্রবাদ অনুযায়ী, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, এক মেষপালক বুটা মালিক মেষ চড়াতে চড়াতে হিমালয়ের পর্বতের এক নির্জন জায়গায় এক সন্ধ্যাসীর দেখা পান। নিজে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সন্ধ্যাসীর যথাসাধ্য সেবা করেন। সন্ধ্যাসী বুটার ওপর খুশি হয়ে বাড়ি ফেরার সময় একটি পোঁটলা ভর্তি করে ধুনির কাঠ কয়লা উপহার দেন। বাড়িতে ফিরে এসে পোঁটলা খুলে তিনি দেখলেন, কোথায় কয়লা, এ যে পোঁটলা ভর্তি সব সোনা দানা। বুটা বুঝতে পারেন যাঁর দর্শন পেয়েছেন তিনি যে সে কেউ নন। উদদ্রান্তের মত ছুটে যান সেই মহাত্মার খোঁজে। চলতে চলতে বুটা এসে পোঁছন সেই গুহার, যেখানে শিব তুষারের রূপ নিয়ে বিদ্যমান। তিনি বুঝতে পারেন এটাই সেই কাঞ্জিতের দর্শন। পরবর্তীকালে তাঁর মাধ্যমেই এই গুহার খোঁজ পান সাধারণ মানুষ।

পুরাণে অমরনাথ গুহার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়না, এছাড়াও সেখানে যে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের বর্ণনা দেওয়া আছে তাতেও অমরনাথের কোনো উল্লেখ নেই। তবে মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রের শ্লোকের নাম ও স্থান বিশ্লেষণ করলে এই রহস্যের সমাধান সম্ভব।

হরিদ্বারে মহেশানি গঙ্গাধর ইতি স্মৃত।

বদরিকাশ্রমমধ্যে কপিনাথেশ্বররোহ্যহম।।



রজতাচলমধ্যে তু কুবেরেশ্বর ঈরীতঃ। অযোধ্যায় কৃত্তিবাসো কাশ্মীরে কপিলেশ্বর।।

কাশ্মীরের ওই কপিলেশ্র-ই আজকের এই অমরনাথ। মহর্ষি কপিলের দ্বারা পূজিত পুরাকালের সেই তুষার লিঙ্গই আজ সমস্ত তীর্থযাত্রীর কাছে বাবা বরফাণী।

যাত্রারম্ভ

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ট্রেন জম্মু স্টেশনে পৌঁছাল। স্টেশন থেকে আমাদের গন্তব্য আগরওলাজির ধর্মশালা। যাঁরা বৈষ্ণোদেবী বা অমরনাথ যাত্রা করেন তাঁদের এবং জম্মুর অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের কাছে এই ধর্মশালা খুবই পরিচিত। এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তীর্থযাত্রীদের থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। কিন্তু আগে থেকে বুকিং করে না গেলে এই সময় থাকার জায়গা পাওয়ার সন্তাবনা খুব কম। আমাদেরও শেষ অবধি তাই পাশের হোটেলেই ব্যবস্থা করতে হল। স্নান করার পর সোজা চলে গেলাম ধর্মশালাতে তুপুরের প্রসাদ পাওয়ার জন্য। গরম ভাত, ডাল, সবজি আর আচার। আহা! কী যে সুস্বাতু লাগল সে বলে বোঝানো যাবে না।

কাল সকালে আমাদের যাত্রা করতে হবে বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে। তাই আজ বিকেলেই জম্মুতে যা যা দেখার দেখে নিতে হবে। আমার ইচ্ছে, খুব বেশি না ঘুরে জম্মুর বিখ্যাত রঘুনাথ মন্দির গিয়ে একটু ভালো করে দেখা। মন্দির দেখে ফিরে এসে রাতের বেলা পরের দিনের প্রোগ্রাম নিয়ে বসলাম। যেহেতু দলের তিন জনের কাছেই CHC (Compulsory Health Certificate) আছে তাই শুধুমাত্র পারমিট হলেই আমরা যাত্রা শুরু করতে পারব। অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের নির্দেশিত আধিকারিকদের সই আর স্ট্যাম্প দেওয়া সি.এইচ.সি. ছাড়া এই যাত্রা করা যাবেনা। প্রত্যেক যাত্রীকে হেলথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার পর তবে যাত্রা পারমিট নিতে হবে। আগামী কাল ভোরবেলা পারমিটের লাইন দিতে হবে তাই একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পহেলগাঁও-এর রাস্তা খারাপ থাকায় আপাতত বন্ধ, তাই বালতাল দিয়ে যাত্রার অনুমতি পেলাম। বালতাল-এর দিকের রাস্তা সাধারণত সবাই দর্শন করে ফেরার জন্য ব্যবহার করে। প্রচণ্ড খাড়া হবার কারণে এই রাস্তায় চড়াই বেশ কষ্টকর। পারমিট অনুযায়ী আমাদের পরশু ভোরের মধ্যে বালতাল গেটে রিপোর্ট করতে হবে। সকাল দশটা নাগাদ একটা শেয়ার গাড়িতে রওনা দিলাম।

পথের কথা

শহরের অলিগলি ছাড়িয়ে খুব তাড়াতাড়ি গাড়ি জাতীয় সড়ক ১-এ-তে পড়ল। সামনে প্রথমে পড়বে পাটনি টপ। খুব জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট, মধুচন্দ্রিমার জন্য আদর্শ। জম্মু থেকে দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার। সেখান থেকে শ্রীনগর-এর দূরত্ব ১৯৫ কিলোমিটার আর তারপর শ্রীনগর থেকে বালতাল প্রায় ১০৫ কিলোমিটার।

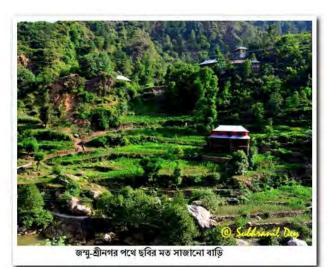
সার সার পাহাড়চূড়া। তাতে চাদরের মতন পাইনের সারি। ফাঁকে ফাঁকে ছবির মতন সাজানো রংবেরঙের একটা-দুটো কাঠের বাড়ি আর মাথার উপর নীল আকাশে মেঘের আলপনা। রোদের ভয়ানক তেজ। পাহাড়ের গায়ে পাক খেতে খেতে যত ওপরের দিকে উঠছি রোদের তাপ যেন আরও বেড়েই চলেছে। তবু রক্ষে যে গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে বেশ সুন্দর হাওয়া আসছে। যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তো দেখি ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে ঘুমিয়েও পড়েছেন।

দ্বপুর প্রায় সাড়ে বারোটা-একটা নাগাদ পাটনিটপের কাছে এসে গাড়ি দাঁড়াল। পাহাড়ের গায়ে খানিকটা জায়গাকে সমতল করে পাঞ্জাবের ফিরোজপুরের শ্রী নীলকণ্ঠ মহাদেব সেবা সমিতির সদস্যরা একটা ভাভারা স্থাপন করেছেন। হাত মুখ ধুয়ে থালাতে অলপত্রটো ভাত আর ডাল নিলাম। খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে আবার বেরিয়ে পড়লাম সামনের দিকে। কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়াবার উপায় নেই। গন্তব্য যে এখনও বহুদ্র। অনেক যাত্রী দেখলাম না দাঁড়িয়ে যতটা পারছেন এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁদের হয় রামবান না হয় বানিহালে র কোনও ভাঙারাতে দাঁড়াতে হবে খাবার জন্য। যদিও তাতে প্রায় বিকেল হয়ে যাবে। পথে চলতে চলতে মাঝে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম পড়ছে। কুড়ি-পঁচিশটা বাড়ি নিয়ে বসতি গড়ে উঠেছে। চা এর দোকান; ছোটো মুদি দোকান। যেন ছবির মত সাজানো।

গাড়ি থামিয়ে চায়ের কাপে চুমুকের সময় চোখে পড়ছে নাম না জানা পাহাড়ি ফুলের মতো সুন্দর ছোটো বাচ্চারা কলকল শব্দ করে চারপাশে খেলা করছে। পাহাড়ের কোলে এই রকম এক একটি গ্রাম যেন এক একটি শান্তির তপোবন। বাড়ির মহিলারা ঘরকন্নার পাশাপাশি বন থেকে ঘাস, কাঠ কেটে মাথায় করে বয়েও আনছেন। পুক্রমেরাও তাঁদের রোজকারের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাহায্য করছেন।

ইচ্ছে থাকলেও বেশিক্ষণ থাকা হয়না। সূর্য মধ্য গগনে। রামবান পার করে গাড়ি চলেছে। এই রাস্তাতে গাড়ির গতি বেশি করার উপায় নেই। একধারে খাড়া পাহাড় আর অন্য দিকে কয়েক হাজার ফুট গভীর খাদ। তার মধ্যে অপরদিক থেকে আসা গাড়িকে যাওয়ার জন্য মাঝে মধ্যেই জায়গা করে দিতে হচ্ছে। একটা বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ল সামনে যত দূর দৃষ্টি চলে গাড়ির লম্বা লাইন!

দেখে তো মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। কোনও গাড়ির যে নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। আমাদের গাড়িও লাইনে দাঁড়িয়ে



পড়ল। নেমে এগিয়ে গেলাম। অবস্থাটা কেন হল যদি বোঝা যায়। স্থানীয় লোকেদের কথায় যা বুঝলাম, এমনিতেই এই জায়গাটার খুব একটা সুনাম নেই। জয়ৢ থেকে বালতাল যাবার পুরো রাস্তার মধ্যে এই অংশটাই সব থেকে খারাপ। বাম হাতে খাদ আর ডান পাশে খাড়া পাহাড়। ওপর থেকে মাঝে মধ্যেই বড় বড় পাথরের চাঙড় খসে পড়ছে। কোনও কোনও জায়গাতে তুটো গাড়ি পাশাপাশি যাবারও উপায় নেই। কিছুটা এগিয়ে দেখলাম যে একটা যাত্রী সমেত গাড়ি খারাপ হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে আছে, চেষ্টা চলছে সেটাকে সারাবার। ফলে পেছনের সমস্ত গাড়ি যাবার রাস্তা হয়ে গেছে বন্ধ। খারাপ গাড়িটাকে কিছু সেনা জওয়ান ঘিরে রেখেছে। এছাড়াও তুটো গাড়ি করে বেশ কয়েকজন জওয়ান পুরো লাইনটাকে পাহারা দিছে। উগ্রপন্থী হামলার ভয়। এই উগ্রপন্থী নামক রোগটা আস্তে আস্তে আমাদের সমাজে ভয়য়র সব অসুখের থেকেও মারাত্মক হয়ে প্রভাব বিস্তার করছে। কোন ওমুধে এ সারবে কেউ জানেনা। নীচে চোখ রাখলাম। রাস্তা থেকে প্রায় ৮০০ ফুট হবে। একটা ছোট নদী অনেকটা U-এর মতো বাঁক নিয়ে তির তির করে বয়ে চলেছে। U-এর পেটের কাছে একটা উঁচু মতো টিলা। তার ওপর বেশ কিছু পাথরের ঘর। খালি চোখে ঠিক মতো দেখা যায়না। ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে দেখলাম যে ওটা একটা ছোট বসতি। দশ-বারোটা ঘরের স্থানীয় বসতি। কিছু মহিলা

ও পুরুষ দেখলাম ঘরের বাইরে বসেও আছেন। ঘরের আঙিনায় গুটিকয়েক খচ্চর ও বাঁধা আছে। এই মানুষগুলো কী ভাবে ওই দুর্গম জায়গাতে বাস করে সেটা ভেবে কোনও কুল পেলাম না। বসতির চারধারেই উঁচু পাহাড়। সবথেকে কাছে যে লোকালয় সেটা প্রায় আট-নয় কিলোমিটার দূরে। তিন দিকে নদী। খুব ছোটখাটোও যদি কিছু কেনবার দরকার পড়ে তবে প্রথমে পাহাড়ের গায়ের পাকদণ্ডি দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার উপরে উঠতে হবে তার পর আবার অতটা দূরত্ব পাড়ি দিয়ে তবে লোকালয়ে পৌছাতে হবে। এই মানুষগুলোর বেঁচে থাকার লড়াইকে দূর থেকে স্যালুট জানালাম।



দশ-পনেরো ফুট করে যাওয়ার পর আবার আধঘণ্টার বিরতি। এভাবেই গাড়ি এগোচ্ছে। আজ যে আমরা বালতাল পৌঁছাচ্ছিনা এটা নিশ্চিত। গাড়ির সারথি শামিম এর কাছ থেকে জানলাম যে নীচের ওই ছোট নদীই সেই কুখ্যাত খুনিনালা। যে সব গাড়ি এই জায়গাতে এসে পুর্ঘটনাতে পড়ে তার বেশিরভাগই গড়িয়ে ওই नालाय शिरा पूरव याय। एटन पूर এकটा पूर्नि অনুভব করলাম না। ঘণ্টা তিনেক এভাবে যাওয়ার পর গাড়ির গতি স্বাভাবিক হল। তুপুরের বদলে বিকেল নাগাদ গাড়ি বানিহাল পার হল। বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন এই এন.এইচ. ওয়ান-এ-এর দায়িতে রয়েছে। আমাদের গাডি এবার ভালো রাস্তা পেয়ে দারুণ গতিতে ছুটছে। সন্ধ্যে নাগাদ অনন্তনাগ পার করলাম। গাড়ি দাঁড় করাবার কোনও লক্ষণ দেখলাম না। শামিম এর সাথে কথা বলে বুঝলাম যে সে চেষ্টা করছে যাতে আজই আমাদের বালতাল পৌঁছে দিতে

পারে। বললাম, যেহেতু আমরা এখনও শ্রীনগরই পৌঁছাইনি তাই অহেতুক তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। রাতটা পথেই কোথাও থেকে পরদিন পৌঁছানো যাবে। আর তাছাডা আমাদের পারমিট অনুযায়ী যাত্রা শুরুর নির্দিষ্ট সময় আগামী পরশু সকালে।

রাত নটা। খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছে। তুপুরে তুচামচ ভাত তো পেটে পড়ার দশ মিনিটের মধ্যেই হজম হয়ে গেছে। তারপর থেকে জল ছাড়া আর কিছুই প্রায় পেটে পড়েনি। বাকীদেরও একই অবস্থা। গাড়ি ছুটে চলেছে। কাঁচ তুলে দেওয়া সত্ত্বেও ফাঁক দিয়ে যেটুকু হাওয়া আসছে তাতেই বাইরের ঠাণ্ডা টের পাওয়া যাছে। আশা করছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীনগর চুকে যাব। জুলাই মাস হওয়া সত্ত্বেও রাতের দিকে এ অঞ্চলের তাপমাত্রা বেশ কম। বলতে বলতেই সারি সারি আলোকজ্জল হাউসবোটের পাশ দিয়ে চলতে চলতে আমাদের গাড়ি শ্রীনগর পোঁছে গেল। ডাল লেকের ধারে ধারে সুন্দর সুন্দর হাউসবোট তাদের মায়াবী রূপের পসরা নিয়ে পর্যটকের জন্য অপেক্ষা করছে। হাতছানি উপেক্ষা করে আমরা এগিয়ে চললাম গন্তব্যের দিকে।

আধঘন্টা মত যাবার পর দেখি রাস্তার ওপর ব্যারিকেড। কী ব্যাপার! কয়েকজন জওয়ান হাতের ইশারাতে আমাদের গাড়ির কাচ নামাতে বলল। ড্রাইভারকে গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করাতে বলে আমাদের বাইরে নামার জন্য বলা হল। কথা বলে জানলাম আজ আমাদের আর সামনে যেতে দেওয়া হবেনা। কারণ এর পরের রাস্তা বেশ বিপদসংকল। উগ্রপন্থী হামলার আশঙ্কা।।

যে যার ব্যাগপন্তর নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে চেকিং-এর লাইনে দাঁড়ালাম। জায়গার নাম গান্ডেরবাল। এখানে বেশ খানিকটা জায়গাকে পুরোপুরি নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে রেখে অমরনাথগামী যাত্রীদের রাত্রিবাসের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিচয়পত্র ও অমরনাথ যাত্রার পারমিট দেখা এবং সব ব্যাগপত্তর ভালো করে তল্পানির পর ভেতরে ঢোকার ছাড়পত্র পেলাম। এই সবের মধ্যেই দেখি বিশাল পাগড়িধারী একজন রাজস্থানি বয়স্ক ভদ্রলোককে জওয়ানরা খুব বকাঝকা করছে। তল্পাশির সময় নাকি ওঁর পাগড়ির মধ্যে থেকে ধূমপানের বেশ কিছু সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। উনি জানতেন না যে ওই ঘেরাটোপের ভেতর কোনও রকম নেশার সামগ্রী নিয়ে যাওয়া যাবেনা। গাড়ি থেকে নামার পরই বেশ ঠাপ্তা টের পেয়েছিলাম।আমরা যে যার ব্যাগ গাড়ি রাখার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাতে রাখা আমাদের গাড়িতে রেখে দিলাম। একটা রাত কোনমতে ঠিক কেটে যাবে। গুধুমাত্র খুব দরকারি জিনিস একটা হাত ব্যাগে নিয়ে প্রথমেই সামনের ভাভারাতে গেলাম কিছু খাবার জন্য। যত হাঁটছি তত বুঝতে পারছি যে সকালের জম্মুর সঙ্গে রাতের এই গান্ডেরবালের তাপমাত্রার কতটা পার্থক্য।

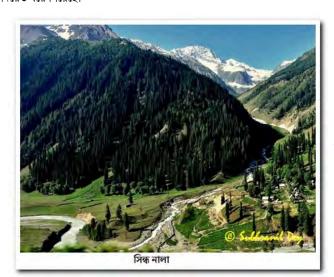
হাত মুখ ধুয়ে গরম ভাত, ডাল আর সজি দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম। এত রাতে এই জায়গাতে যে গরম ভাত পাব, কল্পনাও করিনি। দেখলাম সারি সারি ভাভারাতে আমাদের মতন প্রচুর যাত্রী পরম নিশ্চিন্তে সেবা গ্রহণ করছেন। রাত প্রায় এগারটা। বড় বড় হ্যালোজেনের আলোতে যেটুকু দেখা যায় তাতে বোঝা যাচ্ছে বেশ অনেকটা জায়গা নিয়েই ভারতীয় সেনাবাহিনীর দায়িতে এই যাত্রী নিবাস করা হয়েছে। মাঠের একদিকে সার দিয়ে যেমন খাবার জন্য ভান্ডারা করা হয়েছে তেমনি অপরদিকে ফেলা হয়েছে অনেক ছোট ছোট তাঁব। পুরো মাঠের চারদিকে উঁচু উঁচু টাওয়ার, যেখান থেকে জওয়ানরা কডা নজর রাখছেন। সারাদিনের ক্লান্ত শরীর তাঁবুর ভেতর রাখা কম্বলের তলাতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কখন যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল টেরই পেলাম না।



ভোরের আলোতে ভালো করে জায়গাটাকে দেখলাম। চারদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের সারি, মাঝখানে খানিকটা সমতল নিয়ে এই অঞ্চল। দূরে পাহাড়ের পায়ের কাছে বেশ কিছু বাড়িঘর চোখে পড়ল। পাহাড়ের পেছন থেকে খানিকটা লুকোচুরি খেলার মত করেই সূর্যদেব আত্মপ্রকাশ করলেন। ভোরের প্রথম কিরণ বিপরীত দিকের পাহাড়ের শিখরে সাদা বরফের ওপর পরার পর হীরের মতন ঝকমক করে উঠল। হিমালয়ের যে কোনও স্থানের সৌন্দর্য ও বিচিত্রতা কোনও ভাষা দিয়েই বোঝানো যায়না। এ শুধু চোখ ভরে দেখার।

সবাই মিলে ছটা বাজার আগেই গাডির কাছে পৌঁছালাম। শামিম আগেই গাডির স্বিয়ারিং-এ বসে আছে। গেট এখনও খোলা হয়নি। অবশেষে

গাড়ি ছাড়ার অনুমতি পাওয়া গেল। ভোরের হিমশীতল হাওয়ার সঙ্গে আমাদের গাড়ি যেন ছোঁয়াছুঁয়ি খেলতে লাগল। রাস্তাটা একটা কালো সাপের মত এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে। ত্ব' ধারে সমুদ্রের চেউয়ের মতো পাহাড়ের সারি - ডানপাশে একটা নাম না-জানা নদী সুন্দরী যুবতীর মতো তার সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে পথের ছোটোখাটো বিঘ্নকে জয় করে ছলছল শব্দে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের ঢালে পাইনের সারি। ঢাল ছাপিয়ে বরফের চাদর চলে এসেছে একেবারে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ার দূরত্বে। বরফের সেই পুরু আস্তরণ আস্তে গাস্তে গলে তৈরি হচ্ছে ছোট ছোট জলের ধারা, আর তা মিশছে সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে। শামিম বলল এই নদীর নাম সিন্ধ্ নালা, নদীর খানিকটা অংশ পাকিস্তানের মধ্যে দিয়েও বয়ে গিয়েছে।



সামনে একটা লোকালয় দেখতে পাচ্ছি। জায়গার নাম কঙ্গন। খুব সুন্দর মিষ্টি নামটা। স্থানীয় মানুষেরা সদ্য ঘুম থেকে উঠে রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে ভিড় জমিয়েছে। কাশ্মীরিরা সাধারণত চা খেতে খুব ভালবাসে। চায়ের সঙ্গে রকমারি রুটির পশরা সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সোনমার্গের রাস্তায় চলে এলাম, যার স্থানীয় নাম সোনামার্গ। আস্তে আস্তে লোকালয় শেষ হয়ে এল। দূরে দূরে সবুজ কার্পেট পেতে রাখা পাহাড়ের ঢালে কিছু ঘোড়া আর মাঝে মধ্যে টহলরত জওয়ানদের জিপ, এছাড়া সামনের প্রায় কুড়ি কিলোমিটার আর কিছু চোখে পডল না। রাস্তা আবার খারাপ হতে শুরু করল। এবড়ো খেবড়ো পাথরের ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ি টাল খেতে খেতে এগিয়ে চলল। একটা জায়গাতে এসে দেখি রাস্তাতে ধস নেমেছে। রাস্তা যেটুকু ছিল সেটাও আর নেই। পাথরের উঁচু ঢিপির পাশ দিয়ে কোনমতে গাডির একটা চাকা যেতে পারে। ভাবছি কী করা যায়। বালতালের বেস ক্যাম্প আর মাত্র পাঁচ-ছ'কিলোমিটার। বাকি পথটা কি হেঁটেই যেতে হবে? ও বাবা! শামিম দেখি গাড়ি দাঁড় করাবার বদলে সামনের

দিকে এগিয়ে চলেছে। চোয়াল শক্ত, চোখ স্থির। গাড়ি নিয়ে সোজা উঠে গেল ঢিপির ওপর। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি গেল কাত হয়ে। কয়েক মুহূর্ত পরেই গাড়ি আবার নেমে পড়ল সোজা হয়ে। ধড়ে প্রাণ এল। আর একটু হলেই গাড়ি শুদ্ধ কয়েকশো ফুট গভীর খাদে সমাধি ঘটত। বলা যায় প্রায় ঢেঁকির ওপর সওয়ারি হয়ে শেষ পথটুকু পাড়ি দিলাম।

অবশেষে সামনে চোখে পড়ল আর্মি চেকপোস্ট। শামিমকে বিদায় জানিয়ে ব্যাগপত্তর নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। চেকিং শেষ হলে ঢুকে পড়লাম ভারতীয় সেনা পরিবেষ্টিত একটা বিরাট ঘেরা জায়গার মধ্যে। সকাল ১০:৪৫। আগামীকাল যাত্রা, রাতের মত মাথা গোঁজার একটা আস্তানা তো চাই।

স্বর্গের প্রতিচ্ছবি

তাঁবু ঠিক করে জামা কাপড় পাল্টে নিয়ে ভাভারাতে গিয়ে দাঁড়ালাম আর সবার সঙ্গে। সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়েনি।
এখানের বেশির ভাগ ভাভারাই এসেছে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, জলন্ধর ও আরও অন্যান্য জায়গা থেকে। গরম গরম ভাত, ডাল আর রাজমার
তরকারি দিয়ে বেশ জমিয়ে খেলাম। প্রচুর ভাভারা আর ততোধিক যাত্রী। সমস্ত তীর্থে যেমন বিভিন্ন পসরা নিয়ে রাস্তার দুধারে দোকানিরা ভিড়
জমায়, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গরম জামাকাপড়, পাহাড়ে হাঁটার উপযোগী জুতো, স্থানীয় মানুষদের হাতে তৈরি নকশা করা চুড়িদারের
পিস, বিভিন্ন রকম জড়িবুটি আর মালা, মোবাইলের সিম কার্ডের দোকান, যাত্রার স্মৃতি হিসাবে নিয়ে যাবার জন্য ভোলেনাথের ছবির দোকান
আর অগণিত চায়ের দোকান, কী নেই এই ভিড়ে। অনেক দোকান, অনেক মানুষ আর তাদের অনেক রকম ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা। ঘুরে ঘুরে
দেখতে দেখতে নেশা লেগে যায়।

পরিচয় করলাম আমাদের তাঁবুর বাইরে রাস্তার ধারে একটা ছোটো গুমটি মতো জায়গাতে জলের বোতল আর বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে বসেথাকা তাঁবুর মালিক অলপ বয়সী ছেলেটির সঙ্গে। ইশফাক। বেশ সুন্দর নাম। টিপিকাল কাশ্মীরির মত খাড়া নাক, টকটকে ফরসা গায়ের রং আর গালে হান্ধা কুচকুচে কালো দাড়ি। জিনগত ভাবেই কাশ্মীরি ছেলে বা মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব সুদর্শন হয়। কথা হচ্ছিল ইসফাকের সঙ্গে। সে আর তার বড় ভাই আসিফ মিলে এই চারখানা তাঁবু বসিয়েছে। স্থানীয় যুবকেরা এই সময় কিছু রোজগারের জন্য এই ধরণের বিভিন্ন কাজ করে।

কথা হচ্ছিল কাশ্মীরি যুব সমাজকে নিয়ে।
কিছুক্ষণ কথা বলার পর দেখলাম ইশফাক তার
মন খুলে ধরেছে আমার সামনে। আমাদের মত
যারা তীর্থদর্শন বা বেডানোর জন্য কাশ্মীর যায়



তাদের চোখে এই জায়গা ভূম্বর্গ, কিন্তু যারা থাকে তাদের কাছে নয়। মূল সমস্যা সেই বেকারি। আপেলের ব্যবসা, কেশর, আখরোট, ক্রিকেটের ব্যাট তৈরি করা বা শীত বন্ত্রের ব্যবসা ছাড়া মরশুমের সময় পর্যটন শিল্প থেকে কিছু রোজগার হয় ঠিকই কিন্তু সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ঠিকঠাক শিল্প বলতে আমরা যা বুঝি সেটার অভাব। ইশফাক নিজে বি কম সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। লেখাপড়ার পাশাপাশি বাড়িতে একটা ছোট মুদিখানাও করেছে। ভবিষ্যতে হয়ত ওটাই ওর উপার্জনের মূল জায়গা হয়ে দাঁড়াবে। তীর্থযাত্রীদের জন্য বেস ক্যাম্পের ভেতর তাঁবু করলেও আর সবার মতই ইশফাকের বাড়িও এখান থেকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ কিলোমিটার দূরের কঙ্গন বা সোনমার্গ। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার রাস্তা তারা রোজ সকাল বিকেল পাড়ি দেয় কয়েকটা পয়সার জন্য। আমরা কাশ্মীরের রূপ দেখার জন্য যতই ছুটে ছুটে আসি না কেন, যারা এখানকার ভূমিপুত্র তারা কিন্তু খুব একটা ভাল নেই। বেকারত্বের জ্বালাটা কোথাও যেন চাপা স্ফুলিঙ্গের মত ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। খুব তাড়াতাড়ি যদি এই আগুন নেভানোর ব্যবস্থা না করা হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে ইশফাক বা আসিফ এর মত যুবকেরা অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারে। এটা আমার

বেলা প্রায় দুটো। তাপমাত্রা প্রায় ৮ - ১০ ডিগ্রি। কলকাতায় জানুয়ারি মাসে যে রকম আবহাওয়া থাকে ঠিক তেমনই, শুধু পর্বতশ্রেণীর ফাঁক ফোঁকর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে আসছে তাতেই মনে হচ্ছে তাপমাত্রা বোধহয় অনেকটাই কমে গেছে। বেসক্যাম্পের যে জায়গাতে আমরা আছি সেই অংশটা সমতল হলেও তু'পাশে প্রাচীরের মতো পাহাড়ের সারি উঠে গেছে। যে জিনিসটা চোখে পড়ার মত সেটা হল যে, সেনাবাহিনী বা সরকারি আধিকারিকদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষরাও আপ্রান চেষ্টা করে চলেছেন যাতে কোনও ভাবেই এই স্বর্গীয় পরিবেশের সৌন্দর্য নই না হয়। তু'মাস পর যখন সমস্ত যাত্রীরা ফিরে যাবেন তখন আবর্জনার স্তুপ না পড়ে থাকে।

তাঁবুতে ফিরে এসে ক্লান্তিতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল প্রবল সোঁ সোঁ আওয়াজ আর মানুষের আর্ত চিৎকারে। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গোছে। রাস্তায় যারা ছিল তারা আশ্রয়ের জন্য খোঁজে ছুটছে, যারা তাঁবুতে ছিল তারা তাঁবু বাঁচাবার চেষ্টা করছে। পাহাড়ের মাঝে ঝড়ের পাল্লাতে যারা পড়ছেন তারা ভালো করেই জানেন কী ভয়ঙ্কর এর রূপ। চোখের পলক পড়ার আগেই সব একেবারে তছনছ হয়ে যায়। আবার চকিতেই একেবারে শান্ত। আমাদের তাঁবুও দেখি প্রায় উড়ে যাবার জোগাড়। আসিফ আর ইশফাক দেখি তাঁবুর খুঁটিগুলো আরও গভীরে পুঁতে দিছে। খাট খেকে নামার কোনও উপায় নেই। এরমধ্যেই দেখি শরীর ভীষণ রকম কাঁপতে শুরু করেছে। জামা, প্যান্ট, মোজা, টুপি,কম্বল চাপা দিয়েও কাঁপুনি থামানো যাচ্ছেনা।

সবারই প্রায় একই অবস্থা। কাঁপতে কাঁপতেই সবাই ভিতর থেকে তাঁবুর চারধার চেপে ধরে বসে থাকলাম যতক্ষণ না ঝড়টা একটু কমে। মনে আশঙ্কা জাগল সব কিছু ভেস্তে না যায়। কারণ এই ভাবে বৃষ্টি হলে ওপরে ওঠার অনুমতি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া যাবেনা। এমনিতেই যাত্রার পথ অত্যন্ত খারাপ, তার ওপর এই আবহাওয়া, মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। আসিফ বলল চিন্তার কিছু নেই, এই বৃষ্টি বেশিক্ষণ হবেনা। তবে এর ফলে ওপরে হয়তো আজ রাতে আবার বরফ পড়তে পারে। ওটাই যা চিন্তার। যত বরফ পড়বে ততই কষ্ট বাড়বে। এই মুহুর্তে তাপমাত্রা শুন্যের কাছাকাছি। আরও মিনিট চল্লিশ পর যে ভাবে হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল ঠিক সেই রকম আচমকাই সব থেমে গেল।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম পাশের একটা অস্থায়ী দোকানে যাত্রা মোবাইলের সিমের এর খোঁজে। জম্মুতে পা দেবার পর থেকেই আমার ফোন কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। জম্মু-কাশ্মীরে একমাত্র পোস্ট পেড কানেকশন চালু থাকে।

পরিচয়পত্র, তিন কপি ফটো আর যাত্রার অনুমতিপত্রের জেরক্স দিয়ে একটা বি.এস.এন.এল.এর সিম সংগ্রহ করলাম। বাড়িতে কথা বলায়, তারাও একটু নিশ্চিন্ত হল। দোকানের ছেলেটির নাম ইজাজ। কমার্স নিয়ে স্লাতক ডিগ্রি করেছে, পাশাপাশি দেখলাম খুব সুন্দর গানের গলা। কিছুক্ষণের পরিচয়েই তার এই প্রতিভার নমুনাও পেলাম। অমরনাথ যাত্রার দুমাস এই দোকানই তার ঘরবাড়ি। যাত্রার মরসুম শেষে ফিরে যাবে নিজের ঘর গান্ডেরবালে। সেখানে অপেক্ষা করছে তার মা, বাবা, বিবি আর তিন বছরের ছোট্ট মেয়ে। বছরের বাকি মাসগুলো ইজাজ শ্রীনগরে একটা বড়ো জামা কাপড়ের দোকানে হিসাব রক্ষকের কাজ করে। সেখান থেকে এই তুই মাস সে ছুটি নিয়ে নেয় এই দোকানের সাহায্যে কিছু বাড়তি রোজগারের আশায়। কথা বললে দেখা যাবে যে বেশির ভাগ স্থানীয় ছেলেরই এই একই কাহিনি। দু মাসের এই তীর্থযাত্রা শুধুমাত্র কিছু পুণ্যপিপাসু মানুষের মিলনস্থলই নয়, জড়িয়ে আছে আরও প্রচুর মানুষের হাসি, কায়া, ব্যস্ততা ও তাদের পরিবারেরও ভাল মন্দ। গতকালের গাড়ির ড্রাইভার শামিম থেকে শুরু করে আসিফ, ইজাজ, ইশফাক - আরও অনেক নাম, এরাও সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে কখন অমরনাথজীর দর্শন শুরু হবে আর তারা তাদের পরিবারের জন্য কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারবে।

অনুভবে

সন্ধে নামল অনেক দেরিতে। ঘড়িতে রাত আটটা। পড়ন্ত সূর্যের আলোর ছটা এসে পড়েছে দিগন্তবিস্তৃত পর্বত শ্রেণীর মাথায় চাদরের মতো বিছানো সাদা বরফের উপর। এখন আর বরফের রং সাদা নয়, অস্তগামী সূর্যের আভায় আগুনে লাল। তাঁবু থেকে একটু দূরে ছোট একটা টিলা মতন জায়গাতে বসে হিয়ালয়ের এই অপরূপ শোভা উপভোগের পাশাপাশি মনে পড়ছিল শতদ্রু নদীর উপত্যকাতে কিন্নর রাজ্য ভ্রমণের মনোরম অভিজ্ঞতার কথা।

বেশ কিছুক্ষণ একান্তে কাটাবার পর মনটা একটু চা-চা করতে লাগল। টিলা থেকে নেমে একটু সামনে এগিয়েই দেখলাম রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান। কয়েকজন স্থানীয় লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তুহাতে গেলাস ধরে চায়ের চুমুক দিছে। পরণে আলখাল্লার মতন পোশাক, যার স্থানীয় নাম চোলা। বেশি ঠাণ্ডা লাগলে হাত তুটো বের করে বুকের কাছে জড়ো করে রাখা যায়। চায়ের ফরমাশ করে কয়েকজনের সঙ্গে একটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। পেশাতে এদের মধ্যে বেশিরভাগই ঘোড়াওয়ালা। বছরের বাকি সময় ভেড়া চড়ালেও যাত্রার এই তুমাস তীর্থযাত্রীদের ঘোড়ায় করে অমরনাথজীর দর্শন করাতে নিয়ে যায়। এ এক সাংঘাতিক কঠিন জীবন সংগ্রাম। কিন্তু এত কষ্ট সত্ত্বেও মুখের দিকে তাকালে এতটুকু বোঝার উপায় নেই। এক মুহূর্তেই আপন করে নেবার কি অসীম ক্ষমতা। জাগতিক ত্বঃখ কষ্ট যেন এদের সারল্যের কাছে হার মেনেছে। শহরের জটিল জীবনে অভ্যন্ত মানুষ যখন এই সমস্ত পাহাড়িয়া মানুষের মুখোমুখি হয়, তখন তাদের মনে প্রথমেই এই চিন্তা আসে, এই রকম মানুষও হয়! এতো কষ্টের মধ্যেও এতো আনন্দে এভাবেও বেঁচে থাকা যায়! গরম গরম চায়ে চুমুক দিয়ে দেখলাম ঠিক যা চেয়েছিলাম তাই পাওয়া গেছে। টিপিকাল কাশ্মীরি চা। তুধ, চা পাতা, লবণ আর সামান্য খাবার সোভা দিয়ে বানানো এ এক অভ্বত জিনিস। এখানকার মানুষেরা এই চায়ের দিওয়ানা বললেও কম বলা হয়। তুপুরের পর ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে ঠাণ্ডাটাও বেশ জমিয়ে পড়েছে। গরম চায়ের গেলাস হাতে গলপ করতে বেশ দাকন লাগছে।

তাঁবুতে ফিরে দেখি সঙ্গী বাকী তুজন বেশ জুত করে খাটে বসে গল্পে মশগুল। আমাকে দেখে ইইইই করে উঠল। " আরে দাদা গিয়েছিলেন কোথায় ? আমরা তো আপনাকে খুঁজতে পুরো চত্ত্বর ঘুরে ফেললাম, দেখতে না পেয়ে শেষমেশ ভাবলাম যেখানেই যান তাঁবুতে তো আসবেনই , তাই ফিরে এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। কাল ভোর চারটের সময় না উঠলে পরে অসুবিধা হবে তাই চলুন ভাভারাতে গিয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পরা যাক।" সামনেই জলন্ধরের থেকে আসা শিব শক্তি ভাভারা। বেশ ভিড়। ঢুকে পড়লাম ভেতরে। অনেকটা জায়গা নিয়ে এই ভাভারা। ভেতরে একপাশে লাইন দিয়ে খাবার নেবার পর বসার জন্য চেয়ার টেবিলেরও ব্যবস্থা আছে। অনেক ভিড় থাকা সত্ত্বেও পুরো ব্যাপারটাই বেশ সিস্টেমেটিক ভাবে চলছে। যার ফলে কোন রকম অসুবিধা হচ্ছেনা। খাবারের পদের বাহার দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। এই প্রতিকূল পরিবেশেও তিন রকম রুটি, ভাত, খিচুড়ি, পাঁচ-ছয় রকমের তরকারি, চাটনি, মিষ্টি, পাঁচশ প্রকার পান মশলা, পান এবং সব শেষে কেশর দেওয়া গরম তুধ। জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না! পুরোপুরি একটা বিয়েবাড়ির আয়োজন। খাওয়া শেষ করে তাঁবুতে ফিরলাম রাত দশটা নাগাদ। ঠাগুতে হাত পায়ের সাড় পাওয়া যাচ্ছে না। বুঝলাম আজ রাতে কপালে তুঃখ আছে। সমস্ত পোষাকের উপর তুটো করে পেল্লায় মোটা কম্বল চাপিয়েও যেন মনে হছে গায়ে যেন কিছু নেই। সারা গায়ে কে যেন বরফ ঠাগু জল ঢেলে দিয়েছে। গুড়ি তুঁ, মেরে কম্বলের তলায় ঢুকে গেলাম।

দৰ্শন যাত্ৰা

ভোর চারটে বাজার অনেক আগেই এক ঝটকায় সব কিছু ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়লাম। উফ কী ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা! যেন হাড়ের ভেতর অবধি কাঁপিয়ে দিছে। আলো ফুটতে এখনো ঢের বাকি। এর মধ্যেই বাইরের রাস্তায় পুণ্যার্থীদের কোলাহল টের পাওয়া যাছে। সবাই চেষ্টা করছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাত্রা শুরু করার। সব সারা হলে তিনজনে যখন প্রস্তুত হয়ে তাঁবুর বাইরে পা দিলাম ঘড়িতে সকাল পৌনে পাঁচটা। তাঁবুর পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সামনের পর্বতশ্রেণীর মাঝে হারিয়ে গেছে, "জয় বাবা ভোলে নাথ - জয় বাবা বরফাণী - জয় মাতা পার্বতীজি" ধ্বনি দিয়ে সেদিক দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। প্রায় দেড় কিলোমিটার পর আমাদের যাত্রা পারমিট চেক হবে। তারপর আর কোথাও সেটার দরকার নেই।

এই ভোরবেলাতেও দেখি রাস্তার তুপাশে ভান্ডারাগুলোর স্বেচ্ছাসেবকরা হাতে গরম চায়ের কেটলি, বিস্কুটের প্যাকেট, টফি ছাড়াও আরও অন্যান্য



ঠিক করেছিলাম, প্রথম তিন-চার কিলোমিটার রাস্তা একটানা চলে তারপর কিছুক্ষণ দাঁড়ানো হবে বিশ্রামের জন্য। গতকালের বৃষ্টির ফলে রাস্তার অবস্থা বেশ খারাপ। জায়গায় জায়গায় জল জমেছে। সঙ্গে মিশেছে ঘোড়া আর খচ্চরের বর্জ্য। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। কিছুটা পথ যাবার পরই দেখি সামনের রাস্তা প্রায় খাড়া গিয়ে অন্য একটা রাস্তাতে মিশে গেছে। পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে কোনও রকমে ওপরের রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। আমাদের পাশাপাশি চলছিল একটি পাঞ্জাবি তীর্থযাত্রী পরিবার। দলে তু-তিন জন বয়স্ক মহিলাও রয়েছেন। আমাদের সামান্য সাহায্য নিয়ে তাঁরা দেখলাম বেশ তড়তড়িয়ে খাড়া জায়গাটা পার করলেন। আরও প্রায় আধ কিলোমিটার রাস্তা যাবার পর দেখি সামনে চেকপোস্টে ঘোডাওয়ালা আর পায়ে হাঁটা যাত্রীদের আলাদা আলাদা লম্বা লাইন। চেকিং-

এর পর আমরা ঠিক করলাম মিনিট পাঁচেকের জন্য দাঁড়াব। কিন্তু ঘোড়া আর খচ্চরের গন্ধে দাঁড়ার কার সাধ্য! বাধ্য হয়ে সামনে এগিয়ে চললাম। কোনো যাত্রী যদি ডুলি বা ঘোড়ায় যেতে চায় তবে এখান খেকে সে সব ভাড়া পাওয়া যায়। হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুটা যাবার পর শরীর বেশ গরম হয়ে গেল, বলা উচিত গা প্রায় ঘেমে উঠল। এবার গরম জামা খুলতে হবে। দাঁড়িয়ে পড়লাম পথের পাশে। পথ বলতে পাহাড়ের গা কেটে ফুট চারেকের একটা এবড়ো খেবড়ো পরিসর। বাঁ হাতে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে আকাশ ফুঁড়ে আবার ডান দিকে একটু উঁকি দিলেই দেখা যাবে গভীর খাদ নেমে গেছে যেন পাতাল ভেদ করে। নীচে আর চারধারে বিছানো রয়েছে বরফের চাদর। আশে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়চূড়া।

চলতে চলতে হাঁপ ধরে গেলেই একটু বসে পড়ি। শুরুর সঙ্গীরাও সব বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার আমি দলছুট। এই ভালো হয়েছে। যখন ইচ্ছা পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম, আবার একটু পরেই পথ চলা। চলতে চলতেই পরিচয় হলো গেরুয়া ধারী এক মহারাজের সঙ্গে। পাকাপাকি নিবাস বলে তেমন কিছু নেই। এখন চলেছেন বাবার দর্শনে। দর্শন শেষে আবার চলে যাবেন কেদারের পথে। ওঁর মুখে কেদারনাথ এর কথা শুনে মনটা আবার আনচান করে উঠল।

বছর ছয়েক আগের কথা। যোশী মঠ থেকে বেড়িয়ে গৌরী কুণ্ড আর রামওয়াড়ার রাস্তায় কেদার চলেছি; পথমধ্যে পরিচয় এই রকমই এক সয়াসীর। কোমর অবধি জটা, হাতে লম্বা ত্রিশূল। গায়ের রঙ হিমালয়ের তীক্ষ্ণ রোদ আর সূর্যের প্রখর তাপে তামাটে বর্ণ ধারন করেছে। কপাল জোরে একত্রেই দর্শন হল। ফেরার পথ ধরার সময় বললেন,"এবার আমার যাবার পালা, তুমি চলে যাও তোমার রাস্তায়, আমি চললাম নাগ বাসুকির কোলে বিশ্রাম নিতে। কপালে থাকলে আবার ভেট হবে।" বুঝলাম উনি কিছুদিন কেদারের আরও ওপরে বাসুকি তালে কিছুদিন বিশ্রামের কথা বলছেন। সেবার খুব ইচ্ছে থাকলেও ওঁর সঙ্গ নিতে পারিনি। তবে ওঁর শেষ কথাটা মনে দাগ কেটে গিয়েছিল। " কপালে থাকলে আবার ভেট হবে", পরের বছর হলও তাই। যোশী মঠে দেখা হয়ে গেল তুজনায়। আমি চলেছি বদরীবিশালজীর দর্শনে আর উনি দর্শন শেষে নেমে আসছেন। দেখেই চিনতে পারলেন। প্রণাম করে কুশল জিজ্ঞাসা করায় বললেন, দেহ এখনও সুস্থ, এখান থেকে সোজা চলে যাবেন হিমালয়ের পথে গোমুখ। সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করার ইচ্ছা। এরপর আর দর্শন হয়নি। এবার এই যাত্রায় আবার তাঁরই এক প্রতিবিম্বের সাক্ষাত পেলাম।

তুজনে আন্তে প্রান্ত আন্ত প্রান্ত আট-ন' কিলোমিটার রাস্তা চলে এলাম। দেখতে পেলাম পাহাড়ের গা কেটে খানিকটা সমতলের মতো করে দুখানা ভাভারা খোলা হয়েছে। পথশ্রমে ক্লান্ত যাত্রীরা এখানে দুদন্ত জিরিয়ে নিচ্ছে। কেউবা সামান্য কিছু খেয়েও নিচ্ছে। দর্শন শেষে তবে খাব এই চিন্তা করে আমার আজ আর কিছু খাওয়ার ব্যাপার নেই। তুজনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথে নামলাম। বেশ কিছুটা যাবার পর পথ আরও সক্ষ হয়ে আসে। সামনে দূরে দেখি ঝরনার বরফ গলা জল ঝরঝর শব্দে পাহাড়ের মাখা থেকে নেমে আসছে। যেন কোনও সুন্দরী তক্রণী তার রূপের ডালি সাজিয়ে নিয়ে ছুটে চলেছে পাহাড়ের এক অলিন্দ থেকে আর এক অলিন্দে। পিপাসা পেয়েছিল, ঝরনার এক পাশে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে জল খেয়ে নিলাম। এত সুন্দর স্বাদ বোধ হয় অন্য কোথাও পেয়েছি বলে মনে পড়েনা। ঝরনার সামনে দিয়েই পথ চলে গেছে। লোহার পাইপের ওপর কাঠের পাটাতন ফেলে একটা পুলের মতো করা হয়েছে। খুবই পিছল সে পথ। নীচে তাকালে দেখা যায় ঝরনার জল ওপর থেকে পড়ে বহু দূরে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সক্র সুতোর মতো বয়ে চলেছে। যেন কোনও শিল্পীর তুলিতে আঁকা নিখুত এক ছবি। ক্ষণিকের বিশ্রাম। আবার পথ চলা। চলতে চলতে আবার একা। এপথে একা হয়েও অবশ্য কেউ একা নয়। কেউ না কেউ ঠিক পাশে পাশে চলতে থাকে। কোনো রকম ভয়ের কারণ হলেই সাহায্যের হাত সামনে এগিয়ে আসে।

দেখলাম প্রচুর অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের দলও চলেছে বাবার দর্শনে। বেশ ভালো লাগল। মুখে ভোলেবাবার নাম, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, কলকল করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ওদের দেখে দেহের ক্লান্তি অনেকটা কমে গেল।

কিছুটা চলার পর বুকে বেশ খানিকটা চাপ অনুভব করলাম। প্রায় ১৪০০০ ফুট উঠে এসেছি। অক্সিজেনের মাত্রা এখানে বেশ কম। নিশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। একটা বাঁকের ধারে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। পাহাড়ে চলতে চলতে কখনোই বেশি সময় কোথাও বিশ্রাম নিতে নেই। পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখেছি একবার বসে পড়লে তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটা বেশ কষ্টকর।

পাহাড়ের এই অংশ থেকে সামনের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে, এক বিশাল পর্বতসমুদ্রে আমরা ক'জনা ডিঙি নৌকার মতো ভাসছি। সমুদ্রের চেউয়ের মাথায় ফেনার মতো পাহাড়ের মাথাগুলোতেও বরফের গুজ্রতা। বহু নীচে গিরিখাত সাদা বরফের চাদরে ঢাকা। ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে বেশ কিছু ছবি তুললাম, কিন্তু যে দৃশ্য চোখে দেখছি সেটা বন্দী করব কোন ক্যামেরায়্থ ঘড়িতে প্রায়্ম তুপুর বারোটা। আর বাকী চার-পাঁচ কিলোমিটার পথ। যত পথ ফুরিয়ে আসছে ততই কঠিন হচ্ছে চলা। একটা খুব বড় চড়াই - এর পর সামনে দেখি পথ সোজা নেমে গেছে হিমবাহের মধ্যে। পাহাড়ের গা কেটে বানানো প্রায় দেড়শোটা সিঁড়ি বেয়ে তবে নামতে হবে। একেই পথশ্রমে ক্লান্ত শরীর, তার ওপর ভারবেলা থেকে পেটে পড়েছে গুধু মাত্র বরনার জল। নামতে গিয়ে অন্যমনস্কতায় ডান পাটা গেল আচমকা মচকে। ব্যথায় চোখে জল চলে এল। এতই বেশি ব্যথা করছে যে সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়লাম। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। মনে আশঙ্কা জাগল। তবে কি এতো দূরে এসেও বাবার দর্শন হবে না? এবারে আর ব্যথায় নয়, দর্শন না হবার আশঙ্কায় তুচোখে নামলো জলের ধারা। বেশ কিছুক্ষণ পর পকেট থেকে ক্লমাল বের করে হাঁটুর কাছে কমে বেঁধে দিলাম। হাতের লাঠি তুহাতে ধরে সমস্ত শরীরের শক্তি দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে মনে বললাম, ভোলেনাথ তুমিই রক্ষা কর। তাঁর নাম সম্বল করে আবার পথ চলতে গুক করলাম। প্রতিটা পদক্ষেপে মনে হছে যন্ত্রণায় মাথার ভেতরটা ফেটে যাছে। এক পা এক পা করে সব কটা সিঁড়ি শেষ করে যখন হিমবাহের উপর এসে দাঁড়ালাম ততক্ষণে ডান পায়ের কোনো সাড় নেই।

পথের যাত্রীরা ধ্বনি তোলেন, "বোলো সাচ্চে দরবার কি ... জয় , মাতা পার্বতী কি... জয়, বাল গণেশ কি ... জয়, ভোলে ভাগুরী কি ... জয়।" মনে জোর পাই। সহযাত্রীরা সাহস জোগান, এই তো এসে পড়েছেন, সামনেই বাবার গুহা, আর একটু ... আর একটু । চোখ তুলে তাকাই, মুখে হাসি আনার চেষ্টা করি। মনে মনে চিন্তা করি ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন পার্থকে বলছেন -

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরনং ব্রজ।

অহং তৃাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়ীষয়ামী মা শুচঃ।।
অর্থাৎ সব ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার
শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত কষ্ট থেকে
রক্ষা করব। আমিও এই মুহূর্তে অন্যান্য সমস্ত
চিন্তা পরিত্যাগ করে শিব-শন্তুর শরণাগত
হলাম। আর কী করে যে শরীরে জোর পেলাম
তা বলতে পারব না। পিচ্ছিল বরফে লাঠির মাথা
গোঁথে গোঁথে একপায়ে সামনের দিকে এগিয়ে
চলি। আর মাত্র তুনিলোমিটার। এখান থেকেই
গুহা মুখ দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে গুহা মুখ দেখে
মনে হচ্ছে কোনও যোগী পুরুষ সারি সারি গিরি
শ্রেণীর মাঝে ধ্যান মগ্ন হয়ে বসে আছেন।

শক্তি দাও বাবা...শক্তি দাও। বুঝতে পারি হাঁটু ফুলে আয়তনে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তবে ব্যথা বেশ কমেছে। গুহা মুখের কাছ অবধি প্রায় সাড়ে তিনশো সিঁড়ি সোজা উঠে গেছে। একদম নীচে বেশ কিছু তাঁবুতে পূজার সামগ্রী কেনা বেচা হছে। এইসব অস্থায়ী দোকানগুলো সব বরফের



ওপর পলিথিনের চাদরের উপর বিছিয়ে করা হয়েছে। এদের কাছ থেকে পুজোর সামগ্রী কিনলে ব্যাগপত্র যতু সহকারে রেখে দেন। ফিরতি পথে সংগ্রহ করে নিলেই হল।

এক পা আর হাতের লাঠির সাহায্যে বরফের চাঙড়গুলো টপকাতে টপকাতে এগিয়ে চলেছি। আচমকা দেখি সামনের পথ চিরে গভীর নালা কাটা। জওয়ানরা বরফ গলা জল বের করে দেবার জন্য নালা কেটেছেন। পার হবার উপায় নেই। কিছুটা পথ ঘুরে তবে আবার যাবার রাস্তা। আমার এই অবস্থায় আবার কিছুটা ঘুরে যাবার মানে আরও খানিকটা বাড়তি কষ্ট। একজন জওয়ান আমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন। হাত ধরে পরম যত্নে নালাটা পার করে দিলেন। পার হবার পরে মাথা তুলে দেখি উনি নেই। হয়তো অন্য কারও সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেছেন। মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। একেবারে শেষে একটা বেশ বড়সড় দোকান। এটি অমরনাথ ট্রাস্টি বোর্ডের। এখান থেকেই পুজোর সামগ্রী কিনে সাথে সাথে ব্যাগটা তাদের জিম্মায় দিয়ে দিলাম।

প্রতীক্ষার অবসান

পথ এখনও শেষ হয়নি। সামনে আছে পাথরের সাড়ে তিনশ উঁচু সিঁড়ি। সিঁড়ির তুপাশে প্রায় পাঁচ ফুটের বরফের দেওয়াল। খালি পায়ে গেট পার করে সিঁড়িতে পা দিলাম। কনকনে পাথুরে ঠাণ্ডা। অনেকে পথশ্রমে এতই ক্লান্ত যে, এতদূর এসেও আর এই সিঁড়ি কটা পার করতে না পেরে সিঁড়িতেই বসে বসে চোখের জল ফেলছেন। সেনাবাহিনীর জওয়ানরা তাঁদের ভরসা দিচ্ছেন। খাবার জল দিচ্ছেন। নজর সবদিকে। শিব শন্তুর নাম মুখে নিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে চললাম।

রাখী পূর্ণিমার দিন যদি কেউ অমরনাথ দর্শনের জন্য আসে তবে তার এক অঙ্কৃত অভিজ্ঞতা হবে। ওই দিন হল ছড়ি যাত্রার দিন। এই ছড়ি যাত্রা কবে থেকে শুরু হয়েছিল কেউ জানেনা। কথিত আছে যে, মহর্ষি ভৃগু সর্পরাজ তক্ষকের হাতে একটি রুপো বাঁধানো ছড়ি দিয়ে বলেছিলেন অমরনাথ যাত্রা করার জন্য। এই ছড়ি তাকে পথের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে। তক্ষক ওই ছড়ি নিয়ে বাবা মহাদেবের দর্শন করেছিলেন অক্ষত দেহে। সেই থেকে রাখী পূর্ণিমার দিন হাজার হাজার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রচুর সন্ন্যাসী রূপার তৈরি ছড়ি সঙ্গে রেখে অমরনাথ যাত্রা করেন।

সেই রকমই একটি ছড়ি আজ আমার হাতে। এই ছড়ি না থাকলে এক পায়ে এ যাত্রা হয়তো আমি শেষ করতে পারতাম না। একে একে সব সিঁড়ি পার করে গুহা মুখের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বর্তমানে গুহা মুখের সামনে একটা লোহার ঘেরা টোপ তৈরি হয়েছে। কয়েক বছর আগেও বাবা ভোলেনাথকে স্পর্শ করা যেত। কিন্তু অনেক মানুষের চাপে শিবলিঙ্গের ক্ষতি আটকাতেই এই ব্যবস্থা। গেটের সামনে প্রচুর জওয়ান পাহারা দিছেন। হাতের লাঠি যদিও বাইরে রেখে ঢোকার নিয়ম, কিন্তু আমার এই অবস্থায় ওঁরা আমাকে লাঠি সমেতই গেটের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন। শুধু তাই না, আমাকে লাইনে না দাঁড়িয়ে সবার আগে গিয়ে পুজো দেওয়ার জন্যও তাঁরা বললেন। ধন্যবাদ জানিয়ে সকলের সঙ্গে লাইনেই দাঁড়ালাম। আমার থেকেও খারাপ অবস্থা নিয়ে অনেক যাত্রী বাবার দর্শনের জন্য হেঁটে আসছেন, সেটা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। আমার বদলে তাঁরা যেন এই সুবিধাটুকু পান।

গুহার উচ্চতা প্রায় ১২০-১৩০ ফুট। বরফগলা জল মাথার ওপর বাবার আশীর্বাদের মতন টপ টপ করে ঝরে পড়ছে। গুহাটির গভীরতা বেশি না, মাত্র ৬০ ফুট, আর চওড়ায় ৮০ ফুট মতন। সামনে তাকালেই চোখে পড়লো ডান হাতে আট -নয় ফুট উচ্চতার ধবধবে সাদা বরফের তৈরি শিব লিঙ্গ। একদম বাঁ হাতে উচ্চতায় একটু ছোট মাতা পার্বতীর তুষার প্রতিমূর্তি আর তুজনার মাঝখানে আরও একটু কম উচ্চতার আরও একটি বরফের স্তৃপ। শ্রী গণেশজী - মা আর বাবার মাঝখানে আত্বরে সন্তানের মতো চুপটি করে বসে আছেন। গুহার ভিতর আধো অন্ধকারে একটু ভালো করে তাকাতেই চোখে পড়ল তুটি সাদা পায়রা। বেশ আনন্দ হল। হাত জড়ো করে তুচোখ ভরে দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ পর পরই চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে।এত কষ্টের পর দর্শন পাওয়ায় শরীর আর মনের ক্লান্তি কোথায় যে হারিয়ে গোল সেটা বুঝতেই পারলাম না। অগণিত ভক্তের মুখে ওঁ নমঃ শিবায় ধ্বনি ছাডা কানে আর কোনও আওয়াজ আসছেন।।

রেলিঙের বাইরে দাঁড়ানো এক সৌম্যদর্শন পুরোহিতের সাহায্যে পুজা সম্পন্ন করলাম। তুচোখের আনন্দাশ্রু আর গায়ের কাঁটা কাঁটা ভাব আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল। দেবাদিদেবকে প্রণাম করে বললাম, বাবা দেহটাকে আরো কিছুদিন সুস্থ রেখ, যেন বারে বারে তোমার দর্শন পাই। আর আমার মনকে রেখ মেঘহীন নীল আকাশের মত।

বার বার একজন পরিব্রাজকের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর কথায় বলি -

" Life is a pilgrimage. The wise man does not rest by the roadside inns. He marches direct to the illimitable domain of eternal bliss, his ultimate destination."

- স্বামী বিবেকানন্দ।



~ অমরনাথের তথ্য ∥ অমরনাথের আরও ছবি ∥ অমরনাথ ট্রেকরুট ম্যাপ ~

কর্মসূত্রে একটি বেসরকারি সংস্থায় যুক্ত রয়েছেন শুক্রনীল দে। তবে অন্তরের 'যাযাবর' মানুষটিই তাঁর প্রকৃত আত্মপরিচয়। ভ্রমণ তাঁর কাছে বেঁচে থাকার অন্য নাম, ভালবাসেন ক্যামেরার ফ্রেমে ধরে রাখতে ভাল লাগার মুহূর্তগুলো। পথে বিভিন্ন জাতি ও ভাষার মানুষের সাথে পরিচয় করাটাও আরেক নেশা। প্রথম পছন্দ হিমালয়। ভালবাসেন একা একা হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পাহাড়ের চড়াই উতরাই ভাঙতে। বছরে বেশ কয়েকবার না বেরোলে মনে হয় যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। যতদিন সচল আছেন বেড়ানোর রাস্তাতেই খুঁজবেন তাঁর আকাঞ্জিত বেঁচে থাকার রসদ।



কেমন লাগল : - select - ▼ **মত দিয়েছেন** :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend 🚮 🖢 🖂 ...

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

টি বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

হংকং-এর দিনগুলি রাতগুলি

শ্রাবণী ব্যানার্জি

~ হংকং-এর আরও ছবি ~

'এন্টার দ্য ড্রাগন' সিনেমাটা দেখার পর থেকে হংকং বললে শুধু ক্যারাটে সম্রাট ব্রুস লি-র চেহারাটাই চোখের সামনে ভেসে উঠত। তাই বেশ কিছু বছর আগে যখন স্বামীর কাজের সূত্রে আমাকে কিছুদিন হংকং-এ কাটাতে হয়, তখন প্রথম অনুভব করি কোনও একটি দেশকে ভালোভাবে জানতে হলে কিছুদিন সেখানে বাস করা কতটা জরুরী। ট্যুরিষ্ট হিসাবে কয়েকদিনের জন্যে কোথাও গোলে সেখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা হয় বটে, কিন্তু সেই দেশটাকে ভালোভাবে জানা হয় না। তাই আমার এই লেখাটা সেই অর্থে ভ্রমণ কাহিনি নয়, এটা অনেকটা আমার চোখে হংকংকে দেখার কিছু টুকরো টকরো বিবরণ।

হংকং যাওয়ার আগে গুধু এইটুকুই জানতাম যে আমরা 'ক্লুয়ার ওয়াটার' বলে একটা জায়গায় থাকতে যাছি এবং সেখানে থাকার জন্য আমাদের ফার্নিশড্
ফ্ল্যাট দেওয়া হবে। এয়ারপোর্ট থেকে সমুদ্রের ওপর বিশাল ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ি যত এগোতে লাগল, বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে গোলাম। এত উঁচু উঁচু বাড়ি আর
আলো ঝলমলে শহর আমি খুব বেশি দেখিনি। এ যেন অনেকটা আমেরিকার লাসভেগাস্-এর আলো আর নিউ ইয়র্কের উঁচু বাড়ির একত্র সমাবেশ।
দক্ষিণ চিন সাগরের ধারে এই শহরটি পৃথিবীর বহু বড় বড় শহরকেই টেক্লা দিতে পারে। হংকং শব্দটির মানে হল 'সুগন্ধ বন্দর'। এখান থেকে নাকি সুগন্ধী
ধূপকাঠি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি করা হত। চিনের থেকে লিজ নিয়ে ব্রিটিশরা আসার আগে এখানে মাহের ভেড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মূল দ্বীপ
হংকং ছাড়াও কাউলুন পেনিনসুলা আর নিউ টেরিটোরি মিলিয়ে প্রায় তুশোটার ওপর ছোট ছোট পাহাড় আর দ্বীপ নিয়েই এখনকার হংকং। প্রায় দেড়শো
বছর থাকার পর উনিশশো সাতানব্বই সালে ব্রিটিশরা চলে গেলে হংকং-এর অনেক বাসিন্দাই চিনের আওতায় থাকতে ভয় পায়। তাই নিজেদের দেশ
ছেড়ে কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার মত ব্রিটিশ কমনওয়েলথ দেশগুলিতে চলে যায়। ফলস্বরূপ আজও লোকে মজা করে কানাডার 'ভ্যাংকুভার' শহরকে
'হংকুভার' বলে ডাকে।

অবশেষে আমাদের গাড়ি হংকং-এর নিউ টেরিটোরির 'ক্লিয়ার ওয়াটার বে' নামক জায়গাটিতে এসে পৌঁছাল। সেখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি পাহাড় ও সমুদ্রে ঘেরা 'হংকং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির' মত এত সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় আমি খুব কম দেখেছি। কিন্তু সবথেকে অবাক হয়ে গেলাম ফ্ল্যাটের সাইজ দেখে। হংকং-এর মত জায়গায় শুনেছিলাম লোকে প্রায় পায়রার খুপরিতে বাস করে সেখানে তুহাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট কম্পনাতীত। প্রথমে আমাকে অনেকেই বলেছিলেন প্রতিদিন জানালা দিয়ে পাহাড় আর সমুদ্র দেখতে দেখতে আমি নাকি ক্লান্ত হয়ে যাব। সৌভাগ্যবশত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমি আজ পর্যন্ত ক্লান্ত হইনি। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়টি যেন সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মত ধাপে ধাপে পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে। সমুদ্রের ধারেই প্রকাণ্ড স্যুইমিং পুল আর বিশাল খেলার মাঠ।



ইউনিভার্সিটির মধ্যে বিরাট ফুড কোর্ট এবং তাকে ঘিরে বেশ কিছু রেষ্টুরেন্ট, মিনি সুপার মার্কেট। এমন কী একটি ম্যাকডোনাল্ডস্ও বিদ্যমান! সেই প্রথম আমি ম্যাকডোনাল্ডে ভাত বিক্রি হতে দেখি। এরা যেহেতু চপস্টিক দিয়ে খায় তাই ম্যাকডোনাল্ডের ভাতও একটু আঠা আঠা দলা পাকানো যাতে কাঠি দিয়ে তুলতে সুবিধা হয়।

ইউনিভার্সিটিতে দেখলাম বেশিরভাগ চিনা প্রফেসর হলেও বেশ কিছু আমেরিকান ও ভারতীয় প্রফেসরও আছেন। কেউ আমাদের মত এক বছরের জন্য এসেছেন আর কেউ বা বহুবছর ধরেই আছেন। এদের মধ্যে কয়েকটি বাঙালি পরিবার থাকায় আমাদের সময়টা বেশ ভালোই কাটছিল। মাঝে মধ্যেই রেষ্টুরেন্টে খেতে বেরোতাম। তার মধ্যেই একজন এদেশের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে একটু সতর্ক করে দিলেন। বললেন "মনে রেখ, এদের কাছে টেবিল চেয়ার ও প্লেন বাদ দিয়ে যাদেরই পা ও পাখা আছে সবই খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পড়ে, তাই না জেনে ঝপ করে কোন খাবারের অর্জার দিওনা"। সেদিনের সতর্ক বাণী হংকং-এ থাকাকালীন আমার প্রচণ্ড কাজে লেগেছিল। একদিন এক রেষ্টুরেন্টে গিয়ে দেখি একজন একটি লাল রং-এর পুডিং বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছেন, দেখে আমারও জিতে জল এল। আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করাতে জানলাম, উনি ব্লাড পুডিং খাচ্ছেন। মনে মনে ভাবলাম, ইট ডগ খাবার সময় তো গরম কুকুর খাই না তাই বোধ হয় লাল রং-এর জন্য এর নাম ব্লাড পুডিং। কিন্তু তিনি হাত মুখ নাড়িয়ে বললেন এটা সত্যি সত্যিই রক্ত দিয়ে সেরি পুডিং। সঙ্গে সঙ্গেই আমি চেয়ারটিকে উল্টিয়ে ওনার দিকে অভদ্রের মত পেছিন ফিব্রে বসলাম এবং বলা বাহুল্য ঠিক কোন জন্তুর রক্ত দিয়ে সেটি তৈরি হয়েছিল জিজ্ঞাসা করার মত মানসিকতা আমার ছিল না। দেখলাম এরা খেতে বসে শুরুতেই শুধু মুখে মাছ মাংসগুলো খেয়ে নেয় তারপর সবশেষে শুকনো দলাপাকানো ভাত দিয়ে পেটের ফাঁকফোঁকরগুলো ভরিয়ে নেয়। আমাদের মত ছাঁচড়া চচ্চড়ি দিয়ে পেট ভরিয়ে শেষে পোলাও কালিয়ার জন্য অপেক্ষা করে না। ডিমসাম খাবারটি দেখলাম হংকং-এ খুবই চলে। সকালে প্রাতরাশ থেকে আরস্ত করে বিকেলের জলখাবারের মধ্যে ডিমসাম-এর ছড়াছড়ি। ভেতরে মাংসের বা চিংড়ি মাছের পুর দেওয়া ভাপানো পিঠের মত এই ডিমসাম-এর মানে হল 'যা হুদয় ছুঁয়ে যায়'।





আমাদের ঠিক ওপরের ফ্র্যাটের বাসিন্দা জ্যুডিথ বলে একটি চিনা মেয়ের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুতু হয়ে গেল। ওর সঙ্গে একদিন ফিস মার্কেটে মাছ কিনতে গিয়ে গন্ধে প্রায় অন্নপ্রাশনের ভাত ওঠার মত অবস্থা। দেখলাম মুরগীর মাংসের সঙ্গে পাশে ব্যাং-ও বিক্রি হচ্ছে। একজন প্রফেসর বললেন. ক্ষেক মার্কেটে লোক সাপের রক্ত খেতে যায় তাতে নাকি শরীরের বল বৃদ্ধি হয়। এছাডা গোটা পাখির রোষ্ট, ছোট ছোট গোটা গুয়োর, বড় বড় কচ্ছপ এবং বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার ফুটপাথের প্রায় প্রতিটি রেষ্ট্ররেন্টেই ঝুলতে দেখা যায়। সব দেখে ভনে শরীরটা এতটাই ঝিমঝিম করত যে বুঝলাম মাটির দিকে তাকিয়েই রাস্তায় হাঁটাটাই বাঞ্ছনীয়। নেহাৎ বেআইনী বলে কুকুর বেডাল ঝুলতে দেখি নি. তবে শুনেছিলাম বানরে এদের কোনও আপত্তি নেই।

হংকং যাওয়ার পর থেকেই আমার ছেলে খব সর্দ্দি কাশিতে ভুগছিল। একদিন জ্যুডিথ এসে বলল, ছেলের জন্য ও কিছুটা গরম স্যুপ পাঠিয়ে দিচ্ছে

যেটা খেলে নাকি নিমেষের মধ্যে সর্দ্দি-কাশি সব সেরে যাবে। স্যুপটি কুমীরের মাংসের তৈরি শুনে বললাম, "আমার ছেলে কিছুদিন আগেই ভেজিটেরিয়ান হয়ে গেছে তাই ওসব কিছুই আর খায় না"। উত্তরে জ্যুডিথ বলল, "তোমার ছেলেকে তো কালই আমি ইউনিভার্সিটির ম্যাকডোনান্ডে চিকেন স্যান্ডুউইচ খেতে দেখেছি"। মনে মনে প্রমাদ গুনে বললাম "আমার ছেলে চিকেন ইটিং ভেজিটেরিয়ান"। সেটা গুনে মুখটাকে একটু বেজার করে বেচারী জ্যুডিথ তার ফ্ল্যাটে ফিরে গেল। একদিন কাগজে পড়লাম যারা হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরা যদি প্রতিদিন খালি পেটে গোটা পঞ্চাশেক কাঠ পিঁপড়ে ধরে খেতে পারেন তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। তাই যেদিন আমাদের এক বন্ধু রেষ্টুরেন্টে 'অ্যান্ট ক্লাইম্বিং হিল' বলে একটি খাবারের অর্ডার দিচ্ছিলেন, সেদিন আমার ফ্যাকাসে মুখ দেখে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন – নুডুলস এর মধ্যে ঢোকানো এগুলো পিঁপড়ের মত দেখতে মাংসের দানা সত্যিকারের পিপড়ে নয়, আমি নির্ভয়ে খেতে পারি। সেই কারণে 'ওয়াইফ কেকের' অর্ডার দিলেও আমর গলা কাঁপেনি, কারণ ধরেই নিয়েছিলাম এরা নিশ্চয়ই বউদের মেরে কেক বানায় নি। চালকুমড়ো ও বাদাম দিয়ে বানানো এই 'ওয়াইফ কেক' হংকং-এর খুব জনপ্রিয় খাবার।

ইউনিভার্সিটির মিনি সুপার মার্কেটে ঢুকে প্রথম দিনের সেই অভিজ্ঞতা আজও ভুলতে পারিনি। দোকানে ঢুকে বিশাল লাইন দেখে ভাবলাম খাবার কিনতে হলে নিদেন পক্ষে একঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হবে, তাই বাড়ি গিয়ে আবার কয়েক ঘন্টা বাদে ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখি সেই লাইন আরও বেড়েছে বই কমেনি। অগত্যা আমিও ওই বিশাল লাইনের পেছনে দাঁড়ালাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম মাত্র মিনিট দশেকের মধ্যেই কাউন্টারের কাছে চলে এসেছি। সেই প্রথম হংকং এর লোকেদের কাজের স্পিড সম্বন্ধে আমার চোখ খুলে গেল। দুটি মেয়ে কাউন্টারে বসে আছে আছে যেন এক একজন এক একটি রোবট। তারা হাসেও না বা আমেরিকার মত শুভেচ্ছাও জানায় না কিন্তু কাজের স্পিড দেখলে বোধহয় রোবটও লজ্জা পাবে। তখনও আমি হংকং-এর টাকায় রপ্ত হইনি তাই গুণে দিতে গিয়ে বিপদে পড়লাম। আমাকে ঠেলে পাশে সরিয়ে দিয়ে গুণতে বলল, পরের কাষ্ট্রমার দাঁড়িয়ে আছে। সে দিন থেকে ভয়ে সামান্য এক প্যাকেট বিস্কুট কিনলেও একশো হংকং ডলার ওদের হাতে ধরিয়ে দিতাম এবং যা ফেরৎ দিতো নির্বিকারে নিয়ে চলে আসতাম, সামনে দাঁড়িয়ে টাকা গোনার মত সাহস আর ছিল না। হংকং-এ এই লাইন মেনে চলার ব্যাপারটা চিনের অন্যান্য শহরের থেকে ব্যতিক্রম এখানে কেউ লাইন কাট করে না অর্থাৎ আমাদের দেশের ভাষায় বুদ্ধি খরচ করে ঠেলাঠেলি করে বেলাইনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে না। এদের যন্ত্রের মত স্পিড ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

দেড়শো বছর ধরে ইংরেজরা হংকং-এ থাকলেও দেখলাম এদের ইংরেজির অবস্থা খুবই খারাপ। ইংরেজিতে ইউনিভার্সিটি বললেও ট্যাক্সিওয়ালা বোঝে না তাই একজনকে দিয়ে ওদের ভাষায় 'ফোগেদাইহো' কথাটা লিখিয়ে নিয়েছিলাম অর্থাৎ 'হংকং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি'। ভারতবর্ষের প্রতিটি লোক ইংরেজি বলতে না পারলেও ইউনিভার্সিটি বললে অধিকাংশ শহুরে লোকই দেখিয়ে দিতে পারেন। আসলে এরা পৃথিবীর অন্য



ল্যানটাও আইল্যান্ডে বুদ্ধ মূর্তি

কোনও ভাষা বা সংস্কৃতি শিখতে রাজি নয় বলেই মনে হল। মনে করে তুনিয়ার লোককে তাদের ভাষা বা তাদের আচার অনুষ্ঠান শিখতে হবে। এটাই বোধহয় এদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য।

এক বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, উনি মাছ কিনতে গিয়ে পরিষ্কার বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। এদেশের মানুষের কাছে বাংলা ইংরেজি সবই সমান। আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে সপ্তাহে একবার যে লোকটি ট্রাকে সবজি নিয়ে আসত, তার সঙ্গে মুখাভিনয় করতে করতে এতটাই পোক্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, তখন বোধহয় যোগেশ দত্তকেও হার মানাতে পারতাম। প্রতিবেশীর টব থেকে কিছটা ধনেপাতা ছিঁডে লোকটার নাকের ডগায় ঝলিয়ে দিতাম এবং সেও হাতটাকে সামনের দিকে লাফ মারার মত করে বুঝিয়ে দিত যে পরের সপ্তাহে আনবে। এছাডা কানের কাছে হায় হায় করার মত সারাক্ষণ হায়া' শব্দটা খনতে পেতাম। জ্যুডিথকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, হায়া শব্দটার আলাদা কোন মানে নেই, কোন টোনে বলা হচ্ছে মানেটা তার ওপর নির্ভরশীল। কেউ যদি সাদামাটা ভাবে বলে 'হায়া' তার মানে হল "আছ্ছা ঠিক আছে"। কেউ যদি চোখটাকে কপালে তুলে বলে হাই অ। তার অর্থ হল ওমা কী আণ্চর্য্য আর একনাগাডে 'হায়া হায়া' বলার মানে হল তাডাতাডি কর তাডাতাডি। হংকং-এর লোকেদের দেখলাম মেনল্যান্ড চায়নার লোকজন থেকে জিনিষপত্র সবকিছুর ব্যাপারেই একটা নাক সিঁটকোনো স্বভাব আছে। এরা নিজেদেরকে চিন দেশের চিনাদের থেকে উন্নত বলে মনে করে। একবার দোকানে ইস্ত্রি কিনতে গিয়েও কিছুটা বুঝেছিলাম। তুটো ইপ্লি সামনে রেখে বাঁদিকেরটাতে হাত দিয়ে বলল "চায়না নো গুড নো গুড" আর ডানদিকেরটা দেখিয়ে বলল "ফিলিপস ইউরোপ ভেরি ভেরি গুড"।

আমার ছেলেকে সেপ্টেম্বর মাসে বাডির পাশে ব্রিটিশ ইন্টারন্যাশনাল স্কলে ভর্তি করে দিয়েছলাম। যদিও সেখানে ব্রিটেন বা অন্যান্য দেশের বাচ্চাদের থেকে চিনের বাচ্চারাই বেশি পডত, কিন্তু টিচাররা সবাই ইংরেজ হওয়াতে সবারই ইংরেজি উচ্চারণ পরিস্কার ছিল। হংকং-এর লোকেরা এমনিতে ক্যান্টনিজ ভাষাতে কথা বললেও এখন চিনের সাথে এক হয়ে যাওয়ায় সবাইকে বাধ্যতামূলক ভাবে চিনের জাতীয় ভাষা মান্দারিন শিখতে হয়। আমার ছেলে এক বছরে মান্দারিন ভাষা যা শিখেছিলো তা না বলাই ভালো। পরে অবশ্য শুনলাম ছবি আঁকার মত হরফ-ওলা এই ভাষা শিখতে নিদেন পক্ষে পাঁচ থেকে ছয় বছর সময় লাগে।



হংকং-এ থাকাকালীন স্থানীয় কিছু কিছু ফেষ্টিভাল দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রথম দেখলাম হেমন্তকালের মুন কেক ফেষ্টিভাল। এই সময় ভালো শস্য হয় বলে চাঁদকে পুজো করে এবং চতুর্দিক চিনে লষ্ঠন দিয়ে সাজায়। রাস্তাতে কাগজের তৈরি প্রচুর দ্রাগন ও সিংহদেরও নাচতে দেখা যায়। খাবার হিসাবে অবশ্যই ময়দা আর পদাফলের বীজ দিয়ে বানানো বিভিন্ন সাইজের মুন কেক থাকে। তবে সবথেকে ঝলমলে হল এদের বসন্তকালের চাইনিজ নিউ ইয়ার। এ যেন আমাদের দেশের দুর্গা পূজো ও কালী পুজোর একত্র সমাবেশ। প্রত্যেকেই নতুন জামা কেনে এবং কাছের লোকজনকে ভালো ভালো উপহার দেয়। আত্মীয় বা বন্ধবান্ধবদের বাডিতে খাওয়াদাওয়া হয়। এছাডা বাজি পোডানো বা রাস্তায় কাগজের সিংহের নাচ তো আছেই। তবে সবথেকে মজা পেয়েছিলাম ওদের 'কিংমিং' ফেষ্টিভাল দেখে। হংকং আইল্যান্ডে আমাদের এক বাঙালি বন্ধর ফ্র্যাট থেকে বেরিয়ে দেখি দরজার মুখেই প্রচুর টাকা পোডানো হচ্ছে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম. "এখানে কি জাল টাকার কারবার হয় নাকি"? ভদ্রলোক হেসে বললেন, আরে না না এটা তো

কিংমিং' ফেষ্টিভাল। আজকের দিনে এরা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নকল টাকা, কাগজের তৈরি জামা কাপড় এমন কি কাগজ দিয়ে বানানো প্রমান সাইজের গাড়িও পোড়ায়, যাতে পরপারে গিয়ে জামা কাপড়, টাকা পয়সা বা এর ওর বাড়িতে যাতায়াতের জন্য কোন কষ্ট পেতে না হয়"। কিছুক্ষণ বাদে রাস্তায় নেবে দেখি প্রচুর লোক বাক্স সমেত সার্ট টাই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পোড়াবে বলে। দোকানে দোকানে বিক্রি হচ্ছে কাগজের তৈরি কম্পিউটার, সিডি প্লেয়ার, মায় সেল ফোন পর্যন্ত। জিজ্ঞাসা করতে একজন ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, মর্ত্যে থাকাকালীন যারা আধুনিক টেকনোলজিতে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছিলেন, এই কম্পিউটার ও সেলফোন তাঁদের উদ্দেশ্যে পোড়ানো হবে যাতে ওপরে গিয়েও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে পারেন। আঁৎকে উঠে মনে মনে প্রার্থনা করলাম, নিদেনপক্ষে সেল ফোনটিকে ওনারা যেন পরলোকেই সীমাবদ্ধ রাখেন। এমনিতেই ইহলোকে সেলফোনের অত্যাচারে পথ চলা দায় তাতে আবার আমাদের পূর্বপুরুষরাও যদি আমাদের সঙ্গে সেলফোনে যোগাযোগ রাখতে আরস্ত করেন, তাহলে ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না। হংকং আইল্যান্ডে সেই বাঙালি বন্ধুর ফ্ল্যান্টের সাইজ দেখেও তাজ্জব হয়ে গেলাম। ঘরগুলো এতটাই ছোট যে খাট থেকে হনুমানের মত একটা লাফ দিতে পারলেই সরাসরি বাথটবে পৌছে যাওয়া যায়। সেদিন নিজেদের ফ্রাটে ফিরে এসে মনে হল যেন গড়ের মাঠে ঢুকলাম।

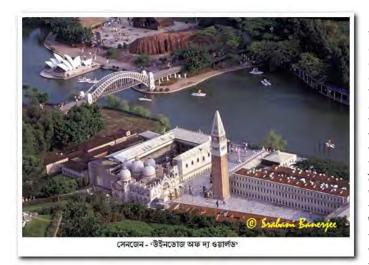
মাঝে মধ্যেই হংকং-এর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরতে যেতাম। সেই ভাবেই একদিন হংকং সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ট্রেনে আধঘণ্টার মধ্যেই 'ল্যানটাও আইল্যান্ড' পৌছে গেলাম। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হল চতুর্দিকে পাহাড়ের মধ্যে বিরাট উঁচুতে বসানো একটি বুদ্ধমূতি। শোনা যায় এই চৌত্রিশ মিটার উঁচু রোঞ্জের মূতিটা পৃথিবীর সবথেকে বড় বসা বুদ্ধমূতি। চতুর্দিকে মেঘে ঢাকা ফাঁকা ফাঁকা পাহাড়ি জায়গাটা দেখলে কে বলবে এটা হংকং শহরের এত কাছে। হংকং-এর সব থেকে বড় ট্যুরিষ্ট স্পট হল ভিক্টোরিয়া পিক। ছোট পাহাড়, ট্রামে চ্ডোতে উঠলে পুরো হংকং শহরটি চোখের সামনে ঝলমল করে ওঠে। এই তল্লাটেই হংকং-এর সব বড়লোকেদের বাসস্থান। কী দিনে বা কী রাতে এই ভিক্টোরিয়া পিক থেকে হংকং শহরটি দেখলে কেউ নিরাশ হবেন না।

আর একটি বিখ্যাত রাস্তা হল নেথান রোড। যদিও পুরো হংকংটাই নিওন লাইটের কল্যাণে প্রচণ্ড আলো ঝলমলে তবুও তার মধ্যে নেথান রোডিট চোখের মত। এটিই কাউলুনের সবথেকে বড় রাস্তা - সিম সা চয় থেকে মংককের দিকে চলে গেছে। সারা রাতই রাস্তাটা এতটা জমজমাটি যে মনে হয় সারাক্ষণই এরা পার্টির আনন্দে নাচছে। রাস্তার দুধারে অজস্র রেষ্টুরেন্ট এবং তারা সবাই বলে যাচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে সুস্বাতু খাবারটা তাদের দোকানেই তৈরি হয়। কাছেই চুংকিং ম্যানসনে দেখলাম প্রচুর সর্দারজী ঘুরে বেডাচ্ছে। সতেরো তলা এই মেনসনে যত ভারতীয়দের দোকান আছে বোধহয় সারা হংকং-এ আর কোথাও নেই। ডাল, মশলাপাতি থেকে মাছের ঝোল সবই এখানে পাওয়া যায়। এছাড়াও সামনেই রাজ্যের পাইরেটেড সিডি, নকল রোলেক্স ঘডি সবই বিক্রী হচ্ছে, দেখলাম সব তুনম্বরীই সমান নয় তার মধ্যেও মান ও দামের তারতম্য আছে। যেমন রোলেক্স ঘডি ফটপাথে দশ ডলার থেকে দুশো ডলার পর্যন্ত সবরকম চেহারা ও দামেই ঘোরা ফেরা করে। দামী দুনম্বরী রোলেক্স কিনতে গেলে ওরা ক্যাটালগ ধরিয়ে দেয় পছন্দ করার জন্য



তারপর সপ্তাহ দুয়েক সময় নেয় সেটাকে বানাতে। ভেতরের মূল ঘড়ির যন্ত্রাংশ জাপানিজ আর বাইরেটা রোলেক্সের নকল। পুলিশ মঝেমধ্যেই এসব দোকান রেইড করে বটে কিন্তু তা 'সমুদ্রে বালির বাঁধ'। এই নেখান রোডের ওপর বিখ্যাত পেনিনসুলা হোটেলে একদিন হাই টি খেতে গেলাম। পঞ্চাশ আমেরিকান ডলার দিয়ে ঠাণ্ডা স্যাডউইচ আর চা খেয়ে ভাবলাম টাকাটা পুরোটাই জলে গেল। কিন্তু পরক্ষণে মনে হল এই হোটেলের ভেতর ঢোকাটাই একটা এক্সপেরিয়েপ। পৃথিবীতে কোথাও একসঙ্গে এত রোলস্ রয়েস্ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি। হোটেলের বাথক্যমে ঢুকেও প্রায় মাথা ঘোরার অবস্থা হল। বাথক্যমের ভেতরে দামী দামী ক্রিষ্টালের ঝাড়লঠন টাঙ্কানো ও সোফা পাতা। এছাড়া ওয়াশবেসিনের সামনে নামী কোম্পানীর সাবান কোলন সবই এতটাই সুন্দরভাবে সাজানো যে দেখে মনে হল লোকে শোবার ঘর ফেলে টয়লেটেই বাস করবে। তাই সেদিনকে খাওয়ার দিক থেকে না হলেও অন্যান্য দিক থেকে আমার হাই টির টাকাটা উসুল হয়ে গিয়েছিল।

হংকং-এ প্রায় সবার হাতেই 'অক্ট্রোপাস' কার্ড। এই একটা কার্ড দিয়েই সবকিছু চালানো যায়। বাস, ট্রেন, রেষ্টুরেন্ট থেকে আরম্ভ করে সুপার মার্কেট প্রায় সব জায়গাতেই এই কার্ড নেয়। টাকা কমে গেলে আবার ভরে নিলেই কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। এই কার্ড পকেটে রেখেই আমরা সারা হংকং ঘুরতাম। মাঝে মধ্যেই রাত্রে ভিক্টোরিয়া হারবারে হাঁটতে যেতাম যেখানে জগৎ বিখ্যাত ক্যারাটে সম্রাট ব্রুস লি-র স্ট্যাচু ছাড়াও জলের ধারে অজস্র রেষ্টুরেন্টের পাশ দিয়ে যেতে দারুণ লাগত। এছাড়াও বারবার আমরা স্টার ফেরিতে চাপতাম। যদিও ভিক্টোরিয়া হারবার এপার ওপার করতে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি লাগত না তবুও জলের মধ্যে থেকে আলো ঝলমলে হংকং শহরটাকে দেখতে এতটাই সুন্দর লাগত যে মনে হত বার বার স্থার ফেরিতেই ফিরে আসি। একবার রবিবারে হংকং সেন্ট্রালে গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। প্রতি রবিবার হংকং-এ বাড়ির কাজের লোকেদের ছুটির দিন। এই সব মেয়েরা বেশিরভাগই ফিলিপিনস থেকে হংকং-এ লোকের বাড়িতে কাজ করতে আসে। প্রতি রবিবার এরা নিজের দেশের লোকেদের সঙ্গে গলপগুজব করতে হংকং সেন্ট্রালে চলে যায়। দেখলাম পায়রার মত ঝাঁকে ঝাঁকে খাবার হাতে এরা রাস্তাঘাটে, পার্কে সতরঞ্চি পেতে বসে আছে। ঠিক যেন পিকনিকের পরিবেশ।



একদিন কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে হংকং-এর কাছে সেনজেন লে একটা জায়গাতে বেডাতে গেলাম। চোদ্দশ সালে মিং ডাইনাস্টির সময় থেকেই ক্ষেতখামার নালাতে ভরা জায়গাটিকে লোকে সেনজেন বলে ডাকতে শুরু করে। সেনজেন কথার মানে হল 'গভীর নালা'। এখন অবশ্য সেটা আর বোঝার উপায় নেই কারণ ক্ষেতখামার-নালার বদলে হাইটেক কোম্পানি আর উঁচু উঁচু বাড়িতেই ভর্তি। সাফারি পার্ক ছাডাও এখানে সবথেকে বড আকর্ষণ হল 'উইনডোজ অফ দ্য ওয়ার্লড'। এখানে সারা পৃথিবীর দ্রষ্টব্য জিনিসগুলিকে ছোট ছোট করে তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু সাধারণ লোকের পক্ষে অতটাকা খরচ করে সারা পৃথিবী ঘোরা সম্ভব নয় তাই ইজিপ্টের পিরামিড, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের তাজমহলের নকল সবই এখানে রাখা আছে। যদিও অনেকেই বলবেন এ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো তবুও বলব সাধারণ মানুষদের একটা আন্দাজ

দেওয়ার জন্য আইডিয়াটা সত্যিই সুন্দর। সবথেকে অবাক লাগল এখানে রেষ্টুরেন্টগুলোর চা ঢালার কায়দা দেখে। বহু দূর থেকে বিশাল নলের মধ্যে দিয়ে সবার টেবিলে কাপে চা ঢেলে দিচ্ছে অথচ কোথাও এতটুক ছলকে পডছে না।

আমার ছেলে রোলার কোস্টারে চাপতে ভালোবাসত বলে আমরা 'ওশান পার্কে' একটা বাৎসরিক টিকিট কেটে নিয়েছিলাম। সামুদ্রিক জন্তু জানোয়ার বা ডলফিন শো ছাড়া এখানকার মূল আকর্ষণ হল খিমপার্ক। এই দুশো একরের পার্কটি পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝখানে করা হয়েছে তাই কেবল কার নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। আমি হার্টফেল করার ভয়ে কোন রাইডেই চাপিনি তবে 'অ্যাবিস'-এ চেপে আমার ছেলেও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। প্রায় পঁচিশ তলা উঁচু টাওয়ার থেকে ঢিলের মত শুণ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আর ঠিক মাটি ছোঁয়ার আগেই খপ করে একটা পাটাতন দিয়ে মানুষগুলোকে ধরে নেয়। একেই রাইডটা পাহাড়ের ওপরে তাতে ঠিক নীচেই সমুদ্র থাকায় মনে হয় যেন কেউ কাউকে পাহাড় থেকে ঠেলে সমুদ্রের দিকে ফেলে দিচ্ছে। এক কথায় এটি পয়সা খরচ করে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়!

হংকং-এ দেখতাম লোকে খুব 'রিপালস বে'তে রিলাক্স করতে যায়। এদেশে মাইলের পর মাইল সীবিচ বলে কিছু নেই সবই পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে টুকরো টুকরো বিচ। এই 'রিপালস বে'তে দেখতাম নর-নারী নির্বিশেষে যৎসামান্য পোষাক পরে সমুদ্রের ধারে সূর্যস্নান করছে। হংকং-এর স্ট্যানলি মার্কেট আর একটি দর্শণীয় জায়গা, যারা বিভিন্ন ধরণের সামুদ্রিক জীবজন্তু খেতে ভালোবাসেন বা সস্তাতে ডজন ধরে জিনিষপত্র কিনতে চান স্ট্যানলি মার্কেট তাদের কাছে স্বর্গ।

হংকং-এর লোকজনের কাছে আতঙ্কের ব্যাপার টাইফুন' বা সামুদ্রিক ঝড়। টাইফুনের ওয়ার্নিং পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বারান্দা থেকে সবকিছু সিরিয়ে নিতে হত। আমার উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের এক আমেরিকান মহিলাকে 'মিস টাইফুন' বলে ডাকতাম। টাইফুন শব্দটা একবার কানে গেলেই উনি হাঁ হাঁ করে ছুটে আসতেন এবং তারপর লোকজনকে পাকড়ে ঘন্টাখানেক টাইফুনের ওপর জ্ঞান দিতেন। তার ফলে আমরা সত্যিকারের টাইফুনের থেকেও ওনার সামনে টাইফুন শব্দটা উচ্চারণ করতে বেশি ভয় পেতাম। হংকং-এ থাকাকালীন সাংঘাতিক টাইফুন দেখার অভিজ্ঞতা একবারই হয়েছিল। একদিন ঝড়ের মধ্যে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি দোতলা বাড়ির সমান চেউ যেন আমাদের বাড়ির দিকে ধেয়ে আসছে। যেহেতু জানতাম নিরাপদে অনেক উচুতে ফ্ল্যাটে বসে আছি তাই সেদিনের উদ্ধাম ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য উপভোগ করতে কোনও অসুবিধা হয় নি।

আমি সবাইকে বলি যদি শহর দেখতে হয় তাহলে সবারই একবার হংকং যাওয়া উচিত। এদের রোবটের মত চালচলন আর ভাবলেশহীন মুখ দেখে প্রথমটা একটু দমে গেলেও দেখা যাবে এখানে সব কিছুই ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। কাজ করতে গিয়ে গালগল্প করে সময় নষ্ট করে না। এদের ব্যবহার যেমন খটখটে, কাজকর্মও ততোধিক চটপটে। অত লোক নিয়েও শহরটিতে প্রায় ট্রাফিক জ্যাম নেই বললেই হয়। রাস্তা পারাপার বেশিরভাগ সময়েই মাটির নীচ দিয়ে হয়ে থাকে যাকে এরা বলে 'সাবওয়ে'। ট্রেন ও বাসের ব্যবস্থা এতটাই ভালো যে গাড়ি থাকাটাই যেন বিড়ম্বনা। পুলিশি ব্যবস্থা এতটাই জোরালো যে রাস্তাঘাটে ক্রাইমের সংখ্যা খুবই কম। প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু বাড়িগুলো যেন আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েই আছে আর তারই মাঝে মাঝে বাচ্চাদের খেলার জায়গা। বাড়ির তলাতেই ট্রেন, সুপারমার্কেট, মাল্টিপ্লেক্স থিয়েটার, পোষ্টঅফিস এমন কী অজস্র ছোটখাটো খাবারের দোকান। কেউ যদি চায় দিনের পর দিন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ না রেখেও দৈনন্দিন জীবন দিব্যি চালিয়ে যেতে পারে। স্থান সন্ধূলানের জন্য বহু বাড়ির ছাদেই খেলার মাঠ, সুাইমিং পুল বা টেনিস কোর্ট চোখে পড়ে। হংকং-এর লোকজন হেসে হাত মুখ নাড়িয়ে গল্প না করলেও এদের নিয়মানুবর্তিতা চোখে পড়ার মতন। বাস ট্রেন এতটাই সময়ে চলে যে একটু তুলকি চালে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে বাস মিস হয়ে যাবার সন্তাবনা। রাস্তায় ডবলডেকার বাস আর লোকজনের ইংরেজদের মতন নিয়মনিষ্ঠ চালচলনের জন্য অনেকেই হংকংকে 'প্রাচ্যের লভন' আখ্যা দিয়ে থাকেন। এক কথায় পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝে চোখ ঝলসানো নিওন লাইটে মোড়া হংকং যেন এক টুকরো বৈদুর্য্য মণি।



~ হংকং-এর আরও ছবি ~

শ্রাবণী ব্যানার্জির জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীত ও ইতিহাস পাঠে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতৃহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে সারা বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত করে বেড়াচ্ছেন।



কেমন লাগল : - select - ▼

মত দিয়েছেন : গড : 0.00 Be the first of your friends to like this.

te!! a Friend f b M.

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বা

ভেনিসে একটা দিন

অর্পিতা কুডু চ্যাটার্জ্জী

~ ভেনিসের তথ্য ~ ভেনিসের আরও ছবি ~

আজ ১৩ মে। কাল এইসময় আমরা হয়তো ইতালিতে পৌঁছে গেছি। প্রথমে যাব মিলান, তারপর ফ্লোরেন্স ও পিসা, আর সব শেষে ভেনিস। অবশ্য আজকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে মনটা একটু খারাপ লাগছে, মনে হচ্ছে এই তিন দিনের কোনও একদিন বৃষ্টির মুখে পড়তে হতে পারে। ইউরোপের আবহাওয়া আন্দাজ করা একটু মুশকিল। সাধারণত গ্রীম্মকালে আবহাওয়া ভালই থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলেই সব মাটি। বৃষ্টি যদিও আমার বেশ পছন্দ, কিন্তু বৃষ্টিতে বাড়িতে বসে গরম চা আর পকোড়া খেতেই বেশি ভালো লাগে। বেড়ানোর জন্য অবশ্যই আলো ঝলমলে পরিষ্কার আকাশই উপযুক্ত।

ইতালির যে কটা জায়গায় ঘুরেছি তার মধ্যে আমার সব থেকে ভালো লেগেছে ভেনিস, তাই তাকে নিয়েই এই লেখা। ১৬ মে সকালে ভেনিস পৌছেছিলাম। মেসত্রে (Mestre) শহর থেকে একটা ফেরি করে ভেনিস আইল্যান্ড-এ এলাম। ভেনিস একটা খুব সুন্দর আর মায়াবী শহর। অগণিত ছোটো ছোটো ওয়াটার ক্যানাল ছড়িয়ে আছে সারা শহর জুড়ে। এখানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য উপায় ছোট নৌকো যার নাম গডোলা। পৃথিবীর আর কোনও শহরে এরকম নেই। ইউনেস্কো পুরো শহরটিকেই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট-এর আখ্যায় ভৃষিত করেছে।

শহর জুড়ে যেমন আছে ওয়াটার ক্যানাল তেমনই আছে ছোট ছোট গলিপথ আর পুরনো সব বাড়ি, যার বেশিরভাগই এখন হোটেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এইসব গলিপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে ⊕ April Kanta Chatanja

হচ্ছিল মধ্যযুগে শেক্সপিয়ারের কোনও নাটকের পটভূমিতে পৌঁছে গেছি, অথবা যেন বেনারসের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াছি। ভেনিসের এই গলিপথগুলো যেমন বহু পুরনো ইতিহাসের সাক্ষী, আবার ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি ও স্থাপত্যে অলংকৃতও। অধিকাংশ বাড়িই পুরনো স্থাপত্যের নিদর্শন। তার মধ্যেই উল্লেখযোগ্য হলো সেন্ট মার্কস ক্ষোয়ার (Saint Mark's Square), বেল টাওয়ার, সেন্ট মার্কস বাসিলিকা (Saint Mark's Basilica), ডোজেস প্যালেস (Doge's Palace), রিয়্যালটো ব্রিজ (Rialto Bridge) এইসব। আর অবশ্যই গভোলা চড়ে জলপথে ভ্রমণ এখানকার মূখ্য আকর্ষণ।



শহরটা খুব জমজমাট, চারদিকে প্রচুর ট্যুরিস্টের ভিড়। প্রচুর দোকান - ঢালাও বিক্রি হচ্ছে ভেনেশিয়ান মাস্ক আর ছোট ছোট কাঠের বা প্লাপ্টিকের তৈরি গভোলা। রিয়্যালটো ব্রিজের আশেপাশে এরকমই অনেক সারি সারি দোকানের ভিড়। আমরাও যথারীতি ওখান থেকেই আমাদের কেনাকাটা সেরে ফেললাম। একটা গ্লাস পেনড্যান্টও কিনলাম কারণ ভেনিস কাচের নানা রকম শৌখিন জিনিস তৈরির জন্যও বিখ্যাত। কাছেই মুরানো (Murano) আইল্যান্ড-এ বেশ কিছু নামী গ্লাস ফ্যাকট্রি আছে, সময়ের অভাবে সেখানে যাওয়া হয়ে উঠলনা। দুপুরে ইতালির বিখ্যাত পিৎজা আর জিলাতো আইস ক্রিম সহযোগে লাঞ্চ সারলাম। তারপর আবার পায়ে বেঁটে দেখতে লাগলাম এই ঐতিহ্যপূর্ণ শহরটিকে।

বিকেলের দিকে গভোলা চড়লাম। যেহেতু গভোলার ভাড়া বেশ বেশি তাই আমরা আরো তিনজনের সঙ্গে শেয়ার করে একটা গভোলা ভাড়া করেছিলাম। আধঘন্টা ধরে গভোলা আমাদের শহরের আনাচে কানাচে ঘোরালো। চালকরা আবার মাঝে মাঝে ইতালিয়ান গান গাইছিল যা শুনে সত্যিই মনে হচ্ছিল কোনো টাইম মেশিনে বসে মধ্যযুগে পৌঁছে গেছি। বেশ লাগছিল। ছোটবেলায় কোন একটা সিনেমায় দেখেছিলাম বাড়ির পিছনের দরজায় নৌকা বাঁধা আছে আর বাড়ির সবাই ওই নৌকা করেই সব জায়গায় যাতায়াত করে। মাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল ইতালির ভেনিস বলে একটা শহরে সত্যিই এমন হয়, সেই তখন থেকে আমার ভেনিস দেখার শখ।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে ভেনিসের রূপই আলাদা। আমরা সেন্ট মার্কস স্কোয়ারে বেল টাওয়ার আর সান মার্কো ব্যাসিলিকার সামনে বেশ কিছুটা সময় কাটালাম। কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে খুব সুন্দর ভায়োলিন বাজিয়ে গান বাজনা হচ্ছিল। ভায়োলিনের সুর পরিবেশ্টাকে আরো মনোরম করে তুললো। ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে এলো, এবার আমাদের চলে যাওয়ার পালা, মনটা যেন কেমন খারাপ লাগছিল, এই শহরে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে এত ভালো লাগছিল যে ফিরে যেতে মন চাইছিল না। যাওয়ার আগে এইটুকু বলে ভেনিসকে বিদায় জানালাম, আবার নিশ্চয় দেখা হবে।







~<u>ভেনিসের তথ্য</u> ~<u>ভেনিসের আরও ছবি</u> ~



স্বামীর কর্মসূত্রে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুটের বাসিন্দা অর্পিতা কুন্ডু চ্যাটার্জি বর্তমানে গোথে ইউনিভার্সিটিতে নিউরোসায়েন্সে পি এইচ ডি করছেন। ভালোবাসেন বেড়াতে আর নানা জায়গার সংস্কৃতি ও খাবারদাবারের স্বাদ নিতে।

কেমন লাগল : - select - ▼

মত দিয়েছেন : গড় : 0.00 Like Be the first of your friends to like this.





= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেডানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =



বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য <u>দেখন এখানে।</u> লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

লেপচাজগতে

উদয়ন লাহিড়ি

~ <u>লেপচাজগতের আরও ছবি</u> ~

মানুষগুলো আমাদের হিসেবে বড্ড বেমানান। জানা নেই শোনা নেই অথচ দেখ, কথা বলছে যেন কবে থেকে আমাদের চেনে! এ আবার কী রকম রে বাবা! আমরা কলকাতায় থাকি তো। আমাদের চোখে এরা অদ্ভৃত। কিন্তু এই করতে করতে আমরা কখন যে এই তামাং ছোট্ট পরিবারটার সঙ্গে মিশে গেছি বুঝতেই পারিনি!

মাত্র ১৯ কিলোমিটার দার্জিলিং থেকে। লেপচাজগত। ছোট্ট একটা জনপদ। চারদিকে রেন ফরেস্ট। সঙ্গী ঘন কুয়াশা আর স্তব্ধতার শব্দ। নিঃসঙ্গ পাথির ডাকে স্তব্ধতার মাত্রা আরও বেশি।

সাকুল্লে শখানেক মানুষ থাকে বলে মনে হয়। সবচেয়ে কাছের বাজার সুখিয়াপোখরি। কোনো মেডিকাল সাহায্য দরকার হলেও ওই সুখিয়াপোখরি না হলে ঘুম। জঙ্গলে শুনলাম লেপার্ড আছে, কখনও পোষা কুকুর তুলে নিয়ে যায় গ্রাম থেকে। আর আছে সজারু, হরিণ আর সালামাভারের মতো বিরল প্রজাতি।

সহজ পায়ে চলা পথে ভিউ পয়েন্ট। আবার কঠিন রাস্তা অতিক্রম করে যাওয়া যায় ঘৄম রক। তার থেকেও খারাপ রাস্তা ধরে আরও আধঘন্টায় হাওয়াঘর বলে একটা পুরানা হাভেলি। ঘুম রক আর হাওয়াঘর যাওয়া বেশ শক্ত। জঙ্গলের রাস্তা। সারাক্ষণ জল পড়ে পিছল। তার ওপর জোঁক। সোনায় সোহাগা। এত ঘন কুয়াসা কিছুই দেখা যায়না। রান্তিরে দেখলাম ঘন কুয়াসার জল বিন্দুতে গাড়ির হেড লাইট ঠিকরে যেন অরোরা বোরিয়ালিস-এর সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা তার ছবি তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে কিছুতেই পারছিলাম না। তাই দেখে অনিল তামাং একটা টর্চ নিয়ে ওই এফেক্ট তৈরি করতে চলে গেল দূরে যাতে আমরা ছবি তুলতে পারি। ভাবুন ব্যপারখানা।





একদিন আমরা কয়েকজন অনেক রাতে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছি। এদিকে ওরা খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে টর্চ হাতে। দেখা হলে সাবধান করে বলল, লেপার্ড আছে। একটাই তো প্রাণ, এত সাহস ভালো না। আরও বলল যে একটাও কুকুর নেই এখানে, সব লেপার্ডে তুলে নিয়ে গেছে। অগত্যা গুটিগুটি পায়ে বাধ্য ছেলের মত ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। এদিকে অনিল আমাদের সজারু দেখাবেই। সেই সজারুটা যেটাকে ও পা দিয়ে ঠেলতে গোল বলের মত হয়ে গড়িয়ে জঙ্গলে চলে গেছিল।

তুপুরে খাওয়া হয়েছে। হঠাৎ মনে হল দার্জিলিং-এর এত কাছে আছি। একবার যাব না? নিদেনপক্ষে বাতাসিয়া লুপ। লোকাল গাড়িতে চলে এলাম ঘুম। এখান থেকে হেঁটে বা গাড়িতে বাতাসিয়া লুপ। মনে হল কিলোমিটার তুয়েক হবে। গাড়ি করে বাতাসিয়া পৌছে ফেরার পথে হাঁটা। পথে ঘুম মনাস্ত্রি। দেখি টয় ট্রেন আসছে। বাইরে থেকে দেখতে বেশি ভালো লাগে না চড়তে প্রশ্বটা মনেই রয়ে গেল। ঘুম

ফেরত এলাম আবার মেঘের রাজ্যে। রাতে বন ফায়ার আর গজলের আসর।

পরের দিন প্রথমেই এলাম জোড়পোখরি। মানে, জোড়া পুকুর। কিন্তু দেখতে পেলাম একটা। একটা বাসুকি সাপের মূর্তি পুকুরের মাঝখানে। মানুষের সাজানো। তবে যাবার রাস্তায় প্রকৃতি দেবীর ঘড়া যেন উপচে পড়েছে।

পৌঁছলাম সীমানা ভিউ পয়েন্ট। নেপাল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভূমিকম্পে আহত মৃত মানুষগুলো দেখা যাচ্ছেনা। দেখা যাচ্ছেনা সেই শিশুগুলোকেও যাদের আদর করার আর কেউ নেই বা খাবার দেবার। কিছু টাকা নিয়ে গেছিলাম নেপালে গিয়ে দেব বলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই নেপাল সরকারের তরফ থেকে। অগত্যা অনলাইনে সেই টাকা জমা দিলাম। পশুপতি মার্কেট আছে এখানে আর আছে পশুপতি মন্দির। মার্কেট তিন কিলোমিটার। বর্ডার ক্রস

মিরিকের আগে একটা চা বাগান পডে। দার্জিলিং চা চেখে দেখলাম। একদম হলুদ রঙ। নিস্তব্ধ চা বাগানে

করে আবার গাডি পাওয়া যায়।

নিরুদ্দেশের দেশে

এরপর মিরিক ঘুরে এগিয়ে চললাম এন জে পির দিকে। গরমটা বাড়ছে। দূরে সমতল দেখা যাচ্ছে।

~ লেপচাজগতের আরও ছবি ~



ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে কর্মরত উদয়ন লাহিড়ি অবসর পেলেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেল : গড: 0.00

Like Be the first of your friends to like this.



প্রকৃতির রঙ-তুলিতে আউলি

আশীষ গঙ্গোপাধ্যায়

~ <u>আউলির আরও ছবি</u> ~

আমাদের এই যাত্রাকে শুধুমাত্র তীর্থযাত্রা বললে ভুল হবে। যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলাম উখি মঠ থেকে যোশীমঠ হয়ে আউলি পর্যন্ত তা এককথায় অনির্বচনীয়।

হরিদার থেকে ঋষিকেশ হয়ে যাত্রা শুরু করে মাঝে উখি মঠে একদিন ও তু-রান্তির থেকে. চোপতা দেওরিয়াতাল দেখে যোশীমঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। এন.এইচ, আটান্ন ধরে ঋষিকেশ থেকে যোশীমঠ যাওয়ার পথে চারটি প্রয়াগ (দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগ) দর্শন করেছি। 'প্রয়াগ' শব্দের অর্থ, দুটি নদীর মিলনস্থল। কোথাও অলকানন্দা-ভাগীরথী, কোথাও অলকানন্দা-পিভার, কোথাওবা অলকানন্দা-মন্দাকিনী। এইভাবে একটির পর একটি প্রয়াণ অতিক্রম করে যোশীমঠের দিকে এগিয়ে চলেছি আর ক্রমশঃ উনাুক্ত হয়ে উঠছে হিমালয় পর্বতমালা। একপাশে সবুজ পাহাড, অন্যপাশে গভীর খাদ। অনেক নীচে বয়ে চলেছে নদী। কোথাও কোথাও সঙ্কীর্ণ, পাহাড়ের ধ্বসে কিছু কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত, হঠাৎ হঠাৎ বাঁকের মধ্যে বিপদ সংকূল এই রাস্তা যেন সাপের মতো পাহাডগুলোকে জডিয়ে ধরে আছে।



এইরকম পাহাড়ি রাস্তায় একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ ড্রাইভারের হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং থাকলে নির্ভয়ে যাত্রাপথের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। আমাদের দুটি গাড়ির চালক সোনু আর নবীন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আউলি দর্শন করিয়ে আবার হরিদ্বারে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। এইরকম চালক সঙ্গী থাকলে গাইডের অভাবও দূর হয়ে যায়। একের পর এক পর্বত অতিক্রম করে, সর্পিল পাহাড়ি পথ ধরে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আতঙ্কজনিত উত্তেজনার মধ্য দিয়ে আমরা যোশীমঠের দিকে এগিয়ে চললাম। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সব ভয় দূর হয়ে গেল।

সন্ধ্যে হয় হয়, তখনও যোশীমঠ থেকে পাঁচ-ছয় কি.মি. দূরে। শুরু হল ঝিরঝির করে বৃষ্টি। ইন্টারনেটে আগেই দেখেছিলাম - বৃষ্টির পূর্বাভাস। যোশীমঠে জি.এম.ভি.এন-এর হোটেলে পৌঁছাতে পোঁছাতে, ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গোল। হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে জানা গেল যোশীমঠ

থেকে আউলি পর্যন্ত যাওয়ার রোপওয়ে বন্ধ আছে - মেরামতি কাজের জন্য। সড়কপথে গাড়িতে ত্রিশ কি.মি. রাস্তা আউলি পর্যন্ত।

নৈশাহার সেরে শুতে যাচ্ছি, তখনও সমানে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। জানিনা, আমাদের আউলি দর্শন শেষ পর্যন্ত হবে কিনা! বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা, ঘুম ভাঙল হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকির আওয়াজে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ट्रांटित्नत निवर्ण माँ फिर्य भागत या प्रथनाम, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। পরিস্কার নীল আকাশ, চারদিক ঝলমল করছে সূর্যের আলোয়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জমে আছে বরফ। রাত্রে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর শুরু হয়েছিল তুষারপাত – আর তারই ফল এই অপরূপ দৃশ্য। প্রাতরাশ সেরে আউলির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। রাস্তার তু-পাশে বরফ, তার মধ্যে হলুদ, বেগুনী, কমলা রঙের নাম না-জানা ফুলের বাহার। ক্রমশঃ আউলির কাছাকাছি আসতে চোখে পড়ল বরফ আর বরফ, চারদিকে শুধুই বরফ। রোপওয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম, বরফে ঢেকে আছে – দাঁড়িয়ে

থাকা গাড়ি, বাড়ির ছাদ, রাস্তা – সব কিছু। গাড়ি থেকে নেমে বরফের ওপর হাঁটার জন্য বিশেষ ধরনের জুতো পড়ে, সিঁড়ি ভেঙে অনেকটা উঠে, মূল রোপওয়ে স্টেশনে পৌঁছালাম। রোপওয়েতে পাঁচ-সাত মিনিট লাগে আউলি উপত্যকায় পৌঁছোতে।



গলতে আরম্ভ করেছে, রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে পডছে। দেরি হলে ফেরা মুস্কিল হয়ে পডবে।

উপত্যকায় নেমে যা দেখলাম, সম্মোহিত হয়ে গেলাম। বরফের পুরু চাদরে ঢেকে আছে সমগ্র উপত্যকা। পশ্চিম খেকে পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের গিরিশূঙ্গগুলি ঘিরে রেখেছে – এই আউলি উপত্যকাকে। তার মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নন্দাদেবী। সম্মুখে উন্মুক্ত প্রসারিত এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সামনে মুগ্ধ বিষ্মের দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রকৃতির রঙ-তুলিতে আঁকা সম্পূর্ণ এক প্রাকৃতিক চিত্র। সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল ওই পর্বতমালা, কী অপরূপ তার গুভ্রতা। তার কাছে কত ক্ষুদ্র আমরা। ঋষি বিষ্কমচন্দ্রকে উদ্কৃত করে বলতে ইচ্ছে করল – আহা। কী দেখিলাম। জন্মান্তরেও ভুলিব না।

স্কিয়িং – এক অন্যতম আকর্ষণ, এই আউলিতে। আউলি গেছে অথচ স্কিয়িং করেনি – এমন পর্যটক বিরল। এই অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করে ফিরে চললাম যোশীমঠের দিকে। সূর্যের তাপে বরফ

~ <u>আউলির আরও ছবি</u> ~



শিক্ষকতা থেকে অবসরের পর আশীষ গঙ্গোপাধ্যায় মজে আছেন ব্যবসা এবং ভ্রমণে।

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00



ভারতের মূল ভূখণ্ডের শেষবিন্দু

সোমদতা চক্রবর্তী

চাকরি সূত্রে আমার স্বামী কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে থাকায় বিবাহ পরবর্তীকালে আমি সেখানকার নিত্যযাঞী। সেই রকমই কোনও এক ছুটিতে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে হঠাৎ আমার ভ্রমণ পিয়াসী মন ডানা মেলতে চাইল। বুক করে ফেললাম "দক্ষিণের কাশী" রামেশ্বরমে টি.টি.ডি.সি-র হোটেল তামিলনাড়। বেঙ্গালুরু থেকে চেন্নাই মাত্র সাত ঘণ্টা পথ, গাড়িতে। বেঙ্গালুরুর স্বভাবোচিত ঠাণ্ডা আবহাওয়াকে সঙ্গী করে বাড়িয়ে দিলাম ইচ্ছার গতিবেগ। ড্রাইভার অ্যালেক্স আমাদের নিয়ে রওনা হল। "চায়ে পিয়োগে স্যার" – ডাকে আলগা ঘুমের চটক ভাঙল। বল্লাম – "পিলাইয়ে"। হাইওয়ের পাশে দক্ষিণী হোটেলে ইডলি সহযোগে ব্রেকফান্ট সেরে আবার রওনা দিলাম – গন্তব্য চেন্নাই-এর এগমোর স্টেশন। পথে ওখানকার বিখ্যাত 'সারভানা ভবন'-এ রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। রাত নাটা চল্লিশে রামেশ্বরম এক্সপ্রেস ছাডতেই আবার ঘুম।

পরদিন সকালে দশটা নাগাদ রেলগাড়ি বিখ্যাত 'পামবাম ব্রিজের' উপর দিয়ে - মোটামুটি সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। একপাশে বিশাল উঁচু পামবাম ব্রিজ আর তার ঠিক নীচে নীল সমুদ্রের বুক চিরে এগিয়ে গেছে রেলপথ - অপূর্ব সে সৌন্দর্য। পৌছালাম রামেশ্বরম। রামেশ্বরম এমন একটা জাযণা, যাকে উইকিপিডিয়া সিটি বললেও আমাদের মতো অত্যাধুনিক নাগরিক জীবনে বড় হওয়া স্নব-রা গ্রামই বলবে। যাই হোক 'হোটেল তামিলনাডু' বেশ ভালো। সেখানে বুক করা স্যুইটে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ সেরে বেলা তিনটেয় টি.টি.ডি.সি. থেকে জিপে রওনা দিলাম গন্তব্য 'ধনুসকোডি'।

এটি ভারতের মানচিত্রে মূল ভ্খণ্ডের শেষবিদ্যা ধনুসকোডি থেকেই নাকি রামচন্দ্র লক্ষা যাওয়ার সেতৃবন্ধন করেছিলেন। রাস্তার ত্র'ধারে সারি বেঁধে চলেছে স্কুল ফেরত ক্ষুদে পড়ুয়ারা। ধনুসকোডি থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসতেই হবে। ত্র'পাশে ব্যাকওয়াটার-এর বুক চিরে এগিয়ে গেছে পিচকালো সোজা রাস্তা। নাম না-জানা জিপ চালক ভাঙা



রেললাইন দেখিয়ে বলল, এটি চেন্নাই-ধনুসকোডি রেলপথ, ১৯৬৪ সালের সুপার সাইক্লোন-এ জলের তলায় হারিয়ে গিয়েছিল। পনেরো কিমি রাস্তা আমাদের এনে দিল সোনালি বালুর ধনুসকোডি সৈকতে।



সেখান থেকে বিশেষ জিপে সাত কিমি বালুকাময় পথে পাডি দিলাম একদা জমজমাট জনপদ ধনুসকোডির দিকে। অদ্ভত বালুকাময় পথ পেরিয়ে উপস্থিত হলাম সাইক্লোনের কোপে অধুনা ভূতুড়ে শহর ধনুসকোডি। নেমেই নজর এল ভগ্নপ্রায় রেলস্টেশন, অদূরেই বিশাল জলের ট্যাঙ্ক। কিছুদুর এগিয়ে চোখে পড়ল একটি শিবমন্দির, সাইক্লোনের সময় জলের গভীরে চলে গিয়েছিল, আবার কালের নিয়মে জেগে উঠেছে। স্থানীয় লোকদের মতে এই জায়গাতেই রামচন্দ্র শিবের উপাসনা করেছিলেন। আরও কিছুটা এগিয়ে দেখলাম একটি চার্চ যার পাশেই ছিল শ্রীলঙ্কার জাফনা যাওয়ার জেটি। চার্চের পিছনে সরু একটি বালির রাস্তা. একপাশে শান্ত ব্যাকওয়াটার অন্য পাশে উত্তাল বঙ্গোপসাগর - শান্ত আর দুর্দান্তের অপূর্ব মিশেল। অদ্ভূত এক শিহরণ হল ভারতমাতার শেষ বিন্দুতে পা দিয়ে। চারদিকে ১৯৬৪ সালের সুপার সাইক্লোনের

ধবংস্কৃপ ইতিহাসে পড়া মহেঞ্জোদাড়ো-হরোপ্পার কথা মনে করিয়ে দিল।

চোখের দেখা শেষ হল একটাসময়ে, মন অবশ্য তারপরেও ঘুরে চলেছে সেইসব ধবংপ্রাপ্ত বাড়ি, পোস্ট অফিস, স্কুল, রেলস্টেশন, চার্চের আনাচে কানাচে। মুক্ত নীল আকাশের নীচে স্মৃতি, আর ইতিহাস হয়ে যাওয়া এত বড় প্রাকৃতিক ধবংসলীলা হৃদয়ে নিয়ে ফিরে আসছি - নাম না জানা সামুদ্রিক পাখির ডাকের সঙ্গে সঙ্গে পিছনে সরে যেতে থাকল উপমহাদেশের শেষ বিন্দু।





কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যশাখার স্নাতক সোমদন্তা চক্রবর্তী কিছুকাল টেকনো ইন্ডিয়া কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে কর্ম এবং বিবাহসূত্রে বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। ভালোবাসেন বেড়াতে।

কেমন্লাগল: - select - ▼

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.



আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com © 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher